প্রচার করে। 'আমি মেজর ডালিম বলছি। শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে।' সারা দেশ জুড়ে আতংক।

সকাল বেলা এই ঘোষণা দেওয়ার জন্য ফারুক অথবা রশিদের কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না। এ কাজটি করেছিল মেজর ডালিম তার নিজ উদ্যোগেই। বলাবাহুল্য, মেজর ডালিম কর্তৃক রেডিওতে এই অনির্ধারিত ঘোষণার প্রতিক্রিয়া হয় কামানের গোলার চেয়েও প্রচণ্ডতর। সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে অজানা ভয়, ভীতি আর আতঙ্ক। মুজিব সমর্থকগণ দিশেহারা হয়ে এদিক ওদিক ছুটতে থাকে। তাসের ঘরের মতো তাদের সকল প্রতিরোধ ক্ষমতা একমুহূর্তে যেন হাওয়ায় উড়ে গেল। রাষ্ট্রীয় প্রশাসনে তাৎক্ষণিকভাবে দেখা দেয় বিশাল শূন্যতা। রাস্তাঘাট জনশূন্য। কেউ ভয়ে ঘরের বাইরে পা বাড়াচ্ছে না। সবাই রেডিও 'অন' করে ক্রমাগত ডালিমের ঘোষণা শুনতে থাকলো, আর পরবর্তী ঘোষণার জন্য উদগ্রীব রইলো। শূন্যতার এই ক্রান্তিলগ্নে প্রধান সমন্বয়কারী ব্যক্তির ভূমিকায় মঞ্চে আবির্ভূত মেজর আবদুর রশিদ। সে ক্যান্টনমেন্টে চতুর্দিকে চরকির মত ঘুরছে। ওয়্যারলেস্ ও টেলিফোনে বিভিন্নস্থানে তিন বাহিনীর সাথে যোগাযোগ রাখছে। জেনারেল জিয়া, খালেদ মোশাররফ, শাফায়াত জামিল, এদের সাথে কথা বলছে। সবাইকে সহযোগিতার আহ্বান জানাচ্ছে।

এই সময় সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল শফিউল্লাহর 'রি-অ্যাকশন'-এর উপর দেশের ভাগ্য বহুলাংশে নির্ভর করছিল। কিন্তু জিয়া, খালেদ মোশাররফ, শাফায়াত জামিলের রহস্যজনক নিরবতাই জেনারেল শফিউল্লাহকে কোন চরম ব্যবস্থা গ্রহণে নিবৃত্ত রাখে। চরম সন্ধিক্ষণে জেনারেল শফিউল্লাহর 'নিষ্ক্রিয়তার' এটাই ছিল একমাত্র অজুহাত।

Signature Not Verified
Tito Scohel
Digitally signed by Tito Scohel
DN: cn=Tito Scohel, o=Muktadhara, c=AU
Date: 2004.11.29 15:10:20 +11'00'

ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের সকালবেলা

সকাল সাড়ে সাতটা। শফিউল্লাহ আর্মি হেডকোয়ার্টারে তার অফিসে বসে মিটিং করছেন। পাশে জেনারেল জিয়া, খালেদ মোশাররফ, কর্নেল নাসিম। কিছুই সিদ্ধান্ত নিতে পারছিলেন না। উদ্‌ভ্রান্ত সেনাপ্রধান।

আমি তখন ঢাকার স্টেশন কমান্ডার। সকাল সাড়ে ছ'টার দিকে তৈরি হচ্ছিলাম, অফিসে যাওয়ার জন্য। চায়ের কাপে ধীরে সুস্থে চুমুক দিয়ে বুটের ফিতা বাঁধছিলাম। এমন সময় ক্রিং ক্রিং ক্রিং শব্দে টেলিফোন বেজে উঠলো। কর্নেল আবদুল্লার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর, 'স্যার, শুনেছেন কিছু?'

'নাহ, কি ব্যাপার?'

'রেডিও আছে আপনার পাশে?'

'হ্যাঁ।'

'তাড়াতাড়ি অন করুন।'

আমি ছুটে গিয়ে রেডিও অন করতেই ভেসে এলো ডালিমের কণ্ঠস্বর 'স্বৈরাচার শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে।'

আমি ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেলাম। হ্যাঁ, কণ্ঠস্বর ডালিমেরই বটে। কিন্তু এটা কি করে সম্ভব। রাষ্ট্রপতি নিহত। এটা কি সেনা-অভ্যুত্থান?

আমি তৎক্ষণাৎ জেনারেল শফিউল্লাহকে ফোন করলাম। ফোন এনগেজ্‌ড। তারপর জেনারেল জিয়ার বাসায় রিং করলাম। ধরলেন বেগম জিয়া। বললাম, 'ভাবী জিয়াকে দেন।' তিনি বললেন, 'ভাই একটু আগেই সে হুড়াহুড়ি করে বেরিয়ে গেছে।'

বললাম, 'কিছু বলে গেছে সে?'

'জ্বি না ভাই।'

শুনেই আমি ফোন রেখে তাড়াতাড়ি বুটের ফিতা বেঁধে ইউনিফরম পরে আমার অফিসে রওয়ানা দিতে উদ্যত হলাম। ক্রিং ক্রিং! আবার ফোন। ধরতেই সেনাপ্রধান শফিউল্লাহর কণ্ঠস্বর, 'হামিদ তুমি ঘটনা কিছু জানো?' বললাম, 'আমি রেডিওতে এসব কি শুনছি? কিছুই বুঝতে পারছি না।' সে বলল, 'ট্যাংক আর্টিলারি ইউনিট স্টেশন ছেড়ে বেরিয়ে গেল, কেউ কিছু জানেনা। তুমি কিছু জানো?' শফিউল্লাহর বিব্রত কণ্ঠস্বর। বললাম, 'আমি তো কিছুই জানি না, অফিসে যাচ্ছি, সেখানে খবর থাকলে শীঘ্র তোমাকে জানাচ্ছি। কিন্তু রেডিওতে তো ঘোষণা দিচ্ছে, এটা সেনাবাহিনীর অভ্যুত্থান। এর মানে কি?'

'ড্যাম ব্লাফ।' শফিউল্লাহ ফোন রেখে দিলো। তাকে মনে হলো খুবই উত্তেজিত।

আমার জীপ বাইরে অপেক্ষা করছিল। আমি তাড়াতাড়ি অফিসে ছুটলাম। আমার স্টেশন হেডকোয়ার্টারে পৌঁছে দেখি প্রচুর সৈন্যদের ভিড়। তারা সবাই জড়ো হয়ে আমার জন্য অপেক্ষা করছে। জীপ থেকে নামতেই তারা আমাকে ঘিরে ধরলো। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'স্টেশন থেকে ট্যাংক ও আর্টিলারি ইউনিট কখন বেরিয়ে গেল, কেউ দেখেছে?' আমার সুবেদার সাহেব জানালেন, 'স্যার, ট্যাংকতো ভোরেই আমাদের পাশ দিয়ে ঐ রাস্তা ধরেই শহরে গেল। ৪৬ ব্রিগেডের ভেতর দিয়েই তো তারা গেল। কেউ তো কিছু বললো না। আর্টিলারি তো আমাদের পাশের ইউনিট। তারা রাতেই বেরিয়ে যায়। কিন্তু তাদের উদ্দেশ্য কেউ বুঝতে পারে নাই। ভোর বেলা ধানমন্ডির দিকে থেকে প্রচণ্ড গোলাগুলির আওয়াজ এসেছে। সকালে রেডিও খুলতেই এই খবর। এখন আমাদের করণীয় কি স্যার?'

দেখলাম সবাই বিভ্রান্ত। বিস্মিত। এরকম ঘটনা সেনাবাহিনীতে এর আগে কখনো ঘটেনি। সবাইকে শান্ত থাকতে উপদেশ দিয়ে আমি জীপ নিয়ে আর্মি হেড কোয়ার্টারের দিকে ছুটলাম। ক্যান্টনমেন্টের বড় রাস্তা ধরে জীপ ছুটে চলেছে। অন্যান্য দিন এ সময় রাস্তাটি যথেষ্ট ব্যস্ত থাকে, আজ প্রায় ফাঁকা।

আমি আর্মি হেডকোয়ার্টারের প্রধান গেটে উপস্থিত হলাম। রোজকার মত গেট খোলা। সেন্ট্রি স্যালুট করলো। আমি হেডকোয়ার্টারে সরাসরি প্রবেশ করলাম। চীফ অব স্টাফ শফিউল্লাহর অফিসে প্রবেশ পথেই ডাইরেক্টর অব অপারেশন কর্নেল (পরে মেঃ জেনারেল) নূরউদ্দিনের অফিস। সেখানে ১৫/২০ জন সিনিয়ার অফিসার

জমায়েত হয়ে জটলা করছে। জীপ থেকে নেমে আমিও সেখানে উপস্থিত হলাম। নুরউদ্দিনের কামরায় ঢুকে দেখি তার টেবিলের উপর একটি রেডিও বাজছে। অফিসাররা গভীর উৎকণ্ঠায় উপুড় হয়ে একই খবর শুনছে। আমি নুরউদ্দিনের কাছে খবর জানতে চাইলাম। সে জানালো; 'স্যার, আপনি যতোটুকু জানেন, ঠিক ততোটুকুই আমি জানি। আপাততঃ খবর ঐখানেই।' সে তার টেবিলের উপর রক্ষিত রেডিওটির দিকে ইঙ্গিত করলো।

বেলা আটটার দিকে ক্যান্টনমেন্টের প্রায় সব বড় অফিসারই নিজ নিজ ইউনিট থেকে প্রকৃত অবস্থা জানবার জন্যে এক এক করে আর্মি হেড কোয়ার্টারে এসে জড়ো হচ্ছিলেন। আমি নূরউদ্দিনের কামরার বারান্দায় দাঁড়িয়ে বেঙ্গল ল্যান্সার ইউনিটের কমান্ডার কর্নেল মোমেনের (পরবর্তিতে ব্রিগেডিয়ার, রাষ্ট্রদূত) সাথে কথা বলছিলাম। তাকে বলছিলাম 'তোমার ইউনিট সব ট্যাংক নিয়ে বেরিয়ে গেল অথচ তুমি কিছুই জানো না।' সে বলল, 'স্যার আমি তো সাতদিনের ছুটিতে। ফারুক সব ট্যাংক নিয়ে শহরে বেরিয়ে গিয়ে এসব কান্ড ঘটিয়েছে।' আমি তাকে বললাম, 'এখন তুমি শহরে একটি জীপ নিয়ে দেখে আসো তোমার ছেলেরা কি করছে।' সে বলল, 'আপনার জীপটা দেবেন। আমি এক্ষুণি গিয়ে অবস্থা দেখে আসছি।' আমি তখন বারান্দায় দাঁড়িয়েই নুরউদ্দীনকে উদ্দেশ্য করে বললাম, 'আরে ভাই, ওকে একটি গাড়ি দাও না... বলতে বলতেই দেখলাম দুটি জীপ কালো ড্রেস পরা সেপাইদের নিয়ে মেইন গেট দিয়ে শোঁ শোঁ করে দ্রুত বেগে এগিয়ে আসছে। আমি তৎক্ষণাৎ ওদিকে কর্নেল মোমেনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললাম, 'ঐ যে দেখ, তোমার কালো পোশাকওয়ালা লোকেরা জীপ নিয়ে এই দিকেই আসছে। একটাকে ধরো।' ততক্ষণে জীপটি দ্রুত বেগে বামদিকে মোড় নিয়ে একেবারে চীফ অব স্টাফের কামরার দিকেই ধেয়ে এসেছে।

কর্নেল মোমেন ওদের দেখে তৎক্ষণাৎ বারান্দা থেকে এক পা নেমে গিয়ে একটাকে ধরতে গেল। সে হাতের ইশারায় জীপকে থামতে বলল। আর যায় কোথায়! ব্রেক কষে সশব্দে জীপটি থামতেই এক লাফে উন্মুক্ত স্টেনগান হাতে গলাফাটা চিৎকার করে বেরিয়ে এলো মেজর ডালিম; Shut up; get away from here -বলেই স্টেনগান লোড করে একেবারে কর্নেল মোমেনের দিকে তাক করে ধরলো।

মোমেন তো একেবারে হ্যাবাচাকা। সে আমতা আমতা করে কি যেন বলবার চেষ্টা করল। আমি দুই হাত দূরে থাকায় কোনমতে বারান্দায় ক্ষুদ্র পিলারের পেছনে নিজের শরীরটাকে আড়াল করতে পারলাম। তবুও মোমেনের উপর ব্রাশ ফায়ার করলে আমারও বাঁচার কোন উপায় ছিল না।

ডালিমের চিৎকার আর স্টেনগানের কড়াক শব্দে এমন ভয়ংকর পরিবেশের সৃষ্টি হলো যে যেসব অফিসার নুরউদ্দিনের কামরায় জড়ো হয়ে কান পেতে গভীর মনোযোগ দিয়ে রেডিও শুনছিলো, তারা কোনকিছু না বুঝেই মহাবিপদ আশঙ্কায় পড়িমরি করে যে যেদিকে পারলো প্রাণ নিয়ে দিলো ছুট। এক নিমিষে ১৫/২০ জন অফিসারের জটলা সাফ! তড়িঘড়ি করতে গিয়ে কেউ চেয়ার উল্টালো, কেউ অন্যজনকে মাড়ালো, একজন তো আস্ত টেবিলই উল্টে ফেলে দিলো। তোপের মুখে পড়ে মোমেন যখন আমতা আমতা করে কিছু বলছিল, সেই ফাঁকে সুযোগ বুঝে পিলারের আড়াল থেকে আমিও দিলাম ভোঁ দৌড়। বিপদে চাচা আগে আপনা প্রাণ বাঁচা!

সবাই এখানে ওখানে গুটি মেরে পজিশন নিলো। আমিও পজিশন নিয়ে যখন দেখলাম কিছু ঘটছে না, তখন আবার আড়ালে উঁকি ঝুঁকি দিয়ে ঘটনাস্থলে ফিরে এলাম। দেখলাম ল্যান্সারের জীপ দু'টি সেখানে দাঁড়িয়ে আছে। তার উপরে বসে আছে কয়েকজন সেপাই। উদ্যত রাইফেল। যে কোনো মুহূর্তে অনল বর্ষণ করতে প্রস্তুত।

চীফ অব স্টাফ হাইজ্যাক!

মেজর ডালিম চীফ অব স্টাফের কামরায়। হাতে তার স্টেনগান। এমতাবস্থায় আমি বিপদের ঝুঁকি নিয়ে শফিউল্লাহর কামরায় ঢুকতে সাহস করলাম না। তখন সেনাপ্রধানের কক্ষে ছিলেন জেনারেল শফিউল্লাহ, জেনারেল জিয়া, ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ, কর্নেল নাসিম (বর্তমান জেনারেল)। এ কয়েক মুহূর্তে কামরার ভেতর কি ঘটলো, চীফ অব স্টাফ শফিউল্লাহর মুখেই শোনা যাক :

আমার অফিসে বসে খালেদ মোশাররফ ও অন্যান্যদের সাথে আলোচনা করছিলাম। তিনি একটু আগেই শাফায়াতের হেডকোয়ার্টার থেকে ফিরেছেন। এমন সময় দড়াম করে দরজা ঠেলে মেজর ডালিম আমার রুমে প্রবেশ করে উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'চীফ কোথায়?' যদিও ঐসময় আমি তার সামনেই বসেছিলাম। তাকে মনে হল যেন অপ্রকৃতিস্থ। তখন কর্নেল নাসিম তাকে শান্ত কণ্ঠে বলল, 'তিনিতো তোমার সামনেই বসে আছেন, দেখছো না?'

সে তৎক্ষণাৎ আমার দিকে সরাসরি স্টেনগান তাক করে বলে উঠলো, 'প্রেসিডেন্ট আপনার সাথে কথা বলবেন। আপনি আসুন।' আমি আমারই অফিস রুমের ভেতর তার এরকম উদ্ধত ব্যবহার পছন্দ করিনি। তাকে বললাম, 'দেখো ডালিম, আমি এইসব হাতিয়ার দেখে অভ্যস্ত। তুমি যদি এটা ব্যবহার করতে এসে থাকো, তাহলে ব্যবহারই করো। কিন্তু আমার দিকে এটা তাক করে রাখবে না।' ঐ সময় জিয়াও পাশে দাঁড়িয়েছিল।

এরপর ডালিম তার স্টেনগান নিচেই নামিয়ে ফেললো এবং বললো; 'স্যার, প্রেসিডেন্ট আপনার সাথে কথা বলতে চান। প্লিজ আসুন।' আমি বললাম, 'কে প্রেসিডেন্ট?'

ডালিম বলল, 'আপনি নিশ্চয় রেডিও শুনেছেন।' আমি তখন তাকে বললাম, 'তিনি তোমার প্রেসিডেন্ট হতে পারেন, কিন্তু আমার প্রেসিডেন্ট নন। আমার যতক্ষণ

পর্যন্ত না ৪৬ ব্রিগেডের শাফায়াত জমিলের সাথে দেখা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত আমি ওখানে যাবো না।'

আমি তখন ৪৬ ব্রিগেডে তার সাথে যাওয়া মনস্থ করলাম। জিয়া নিরুত্তর পাশেই দাঁড়িয়ে রইলো। এই ছিল অফিসের ভেতর সংক্ষিপ্ত নাটক ও বাক্য বিনিময়।"

এবার অফিসের বাইরের ঘটনা দৃশ্যপটে আবার ফিরে আসা যাক। আমি ততক্ষণে উঁকিঝুঁকি মেরে ঘটনাস্থলে ফিরে এসেছি। কিন্তু শফিউল্লাহর অফিসের ভেতর ঢুকবো কি ঢুকবো না, ইতস্ততঃ করছিলাম। এমন সময় দেখি তার অফিসের দরজা খুলে গেল। বেরিয়ে এলেন জেনারেল শফিউল্লাহ। তার পেছনে পেছনে স্টেনগান হাতে মেজর ডালিম। শফিউল্লাহর মুখ কালো, গম্ভীর। স্পষ্ট বুঝা গেল একান্ত অনিচ্ছায় তিনি ডালিমের সাথে বেরিয়ে আসছেন। ডালিমের পিছনে জেনারেল জিয়া, ডেপুটি চীফ অব স্টাফ। শফিউল্লাহ নিজের স্টাফ কারেই উঠলেন। ডালিম পেছনে। জিয়া তাকে সহাস্যে বললেন, 'Come on Dalim, in my car.'

'No Sir. I don't go in General's car.' ডালিমের সুস্পষ্ট জবাব, বলেই স্টেনগান উঁচিয়ে তার সশস্ত্র জীপে চড়ে বসলো। ডালিমের পেছনে চললেন জেনারেল জিয়া। তার পেছনে ডালিমের দ্বিতীয় সশস্ত্র জীপ। শোঁ শোঁ করে বেরিয়ে গেল চার চারটি গাড়ি। রীতিমত তোলপাড়। পুরো অপারেশন শেষ হতে সময় লাগলো ৫ থেকে ৭ মিনিট মাত্র।

খোদ আর্মি হেডকোয়ার্টার থেকে আর্মি চীফ অব স্টাফ হাইজ্যাক! অবিশ্বাস্য নাটকীয় ঘটনা। চীফ অব স্টাফকে নিয়ে কনভয় বেরিয়ে যাওয়ার পর আমরা একে অন্যের মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। কিছু বুঝে উঠবার আগেই সত্যি কি অদ্ভুত ব্যাপারই না ঘটে গেল। ঘটনাটি নিজেদেরই বিশ্বাস হচ্ছিলো না। এবার আমরা যারা ঘটনাস্থলে দাঁড়িয়ে ছিলাম, একে অন্যের দিকে তাকিয়ে হো হো করে হেসে উঠলাম। মজার ব্যাপার, রেডিওতে তখনও ক্রমাগত মেজর ডালিমের ঘোষণাই চলছিলো। অথচ ডালিম তখন আর্মি হেড কোয়ার্টারে।

আসলে সকাল থেকে সমস্ত ব্যাপারই ছিল অনিশ্চয়তা, উত্তেজনায় ভরপুর। প্রেসিডেন্টের হত্যাকান্ডের মত আকস্মিক ঘটনায় সবাই ছিল কিংকর্তব্যবিমূঢ়। তড়িৎ অ্যাকশনের বদলে চলছিল ক্লোজ ডোর মিটিং, সলাপরামর্শ। আর্মি হেডকোয়ার্টারে ঢুকে সবার চোখের সামনে একেবারে আর্মি চীফ অব স্টাফ হাইজ্যাক! তাজ্জব ব্যাপার! এসব দেখে আমার নিজেরই মাথা ঘুরে যাওয়ার উপক্রম হলো। যেন বুদ্ধিশুদ্ধি সব লোপ পেয়ে গিয়েছিল। আমি আর বিলম্ব না করে আমার জীপ ডেকে স্টেশন হেডকোয়ার্টারের দিকে রওয়ানা দিলাম।

আর্মি হেডকোয়ার্টার থেকে সেনা প্রধানের কনভয় সোজা ৪৬ ব্রিগেডের ফার্স্ট বেঙ্গল ইউনিট লাইনসে গিয়ে উপস্থিত হলো! একজন জুনিয়ার অফিসার ক্যাপ্টেন হাফিজুল্লাহ সেখানে দাঁড়িয়েছিল। সে 'চীফ অব স্টাফকে' অভ্যর্থনা করে কমান্ডিং অফিসারের কামরায় বসাতে নিয়ে যায়।

ফার্স্ট বেঙ্গল লাইনে শফিউল্লাহ যখন পৌছেন, তখন সেখানে অভ্যুত্থানের নায়ক মেজর রশিদ ও উপস্থিত ছিল। তার সাথে আশেপাশে বিদ্রোহী সৈন্যদের কিছু অংশ এবং দুটি ট্রাকও ছিল। শফিউল্লাহ দেখেন ৪৬ ব্রিগেডের সৈন্যরা আশেপাশে হৈ চৈ করছে। তার সামনেই নাকি ৪৬ ব্রিগেডের একজন অফিসার রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবের ফটো নামিয়ে আছাড় মেরে ভেঙ্গে ফেললো।

সেনা বাহিনী প্রধান কর্নেল শাফায়াত জামিলের হেড কোয়ার্টারে উপস্থিত। সেখানে উপস্থিত অভ্যুত্থানের নায়ক মেজর রশিদ, মেজর ডালিম। নেই শুধু ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াত জামিল। সেখান থেকে শফিউল্লাহ টেলিফোনে এয়ার চীফ এবং নাভাল চীফের সাথে ঘটনা প্রবাহ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলাপ করলেন এবং তাদেরকে বেঙ্গল লাইনে আসতে অনুরোধ করলেন। তার আশেপাশে তখন সব জুনিয়র অফিসার। এমন সময় মেজর রশিদ অত্যন্ত বিনীতভাবে তার কাছে এগিয়ে এসে বললো, 'স্যার, রেডিও স্টেশনে চলুন। সবাই ওখানে আপনার জন্য অপেক্ষা করছে।' কর্নেল শাফায়াতের ব্রিগেড মেজর হাফিজউদ্দিনও রশিদের সাথে যোগ দিয়ে তাকে রেডিও স্টেশনে যেতে অনুরোধ করতে শুরু করলো। শাফায়াত কিন্তু তখনো ধারে কাছে আসছে না। ঠিক ঐ মুহূর্তে কোথায় ছিল তার অবস্থান? কার সাথে তখন সে পরামর্শ করছিল? এসব জানা যায়নি।

বিভ্রান্ত চীফ অব স্টাফ!

মজার ব্যাপার, সেনাসদর থেকে শফিউল্লাহর পেছন পেছন একসাথে এলেও হঠাৎ ৪৬ ব্রিগেড লাইনে এসে জিয়া মোড় ঘুরে অন্য দিকে চলে যান, খুব সম্ভব শাফায়াতের কাছে। তিন বাহিনী প্রধান ফার্স্ট বেঙ্গল লাইনে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় লিপ্ত হলেও সেখানে জিয়া এবং শাফায়াত ছিলেন অনুপস্থিত। অথচ তারা দুজনেই ছিলেন কাছে। সেনাসদর থেকে শফিউল্লাহ ৪৬ ব্রিগেড লাইনসে আসেন শুধুমাত্র শাফায়াতের সাথে কথা বলার জন্য, অথচ সেখানে পৌছে দেখেন শাফায়াত তার ধারে কাছেই আসছে না। তাকে এড়িয়ে চলছে। বরং তার স্টাফ অফিসার মেজর হাফিজকে দেখা যায় রশীদের সাথে ঘুরছে। পরে শফিউল্লাহ আমার কাছে স্বীকার করেন যে, আসলে ঐ গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে শাফায়াত জামিলের নিষ্ক্রিয়তাই তাকে কোন অ্যাকশনে যেতে বিরত থাকতে বাধ্য করে। অবস্থাদৃষ্টে তার তখন ধারণা হয়, শাফায়াত ও তার উল্লসিত ব্রিগেড অভ্যুত্থানের পক্ষে রয়েছে। কেন ঐ সময় শাফায়াত জামিল নিষ্ক্রিয় থাকলো? ঘটনাপ্রবাহ থেকেই এর জবাব খুঁজে পেতে হবে। শুধু শাফায়াত নয়, ঐ নাজুক মুহূর্তে, প্রকৃতপক্ষে জিয়া, খালেদ মোশাররফ, শাফায়াত জামিল এই তিনজনের রহস্যজনক ভূমিকা শফিউল্লাহকে বিভ্রান্ত করে।

ইতিমধ্যে রিয়ার অ্যাডমিরাল এম এইচ খান এবং এয়ার মার্শাল খন্দকারও ব্রিগেড এরিয়াতে পৌছে গেছেন। তিন বাহিনী প্রধান সংক্ষিপ্ত আলোচনায় লিপ্ত হলেন।

অভ্যুত্থানের একটি গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত। সকাল ১০.০০ ঘটিকা। সারাদেশে শ্বাসরুদ্ধকর অবস্থা।

সেনাপ্রধানের সামনে দুটি পথই খোলা ছিল। (এক) ৪৬ ব্রিগেড ট্রুপস্ নিয়ে শহরে বিদ্রোহী দুটি ইউনিটের উপর আঘাত হানা এবং মুখোমুখি সংঘর্ষে লিপ্ত হওয়া। (দুই) পরিবর্তনশীল অবস্থা মেনে নেয়া।

রক্তপাত ও সংঘর্ষ এড়াতে জেনারেল শফিউল্লাহ দ্বিতীয় পথই বেছে নিলেন। আধ ঘন্টার বেশি সেনা বাহিনী প্রধান শাফায়াতের ৪৬ ব্রিগেড লাইনস্-এ ছিলেন। এরপর তারা সেখান থেকে শাহবাগে অবস্থিত রেডিও অফিসে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন।

ইতিমধ্যে মেজর রশিদ ডালিমকে সেখানে রেখে দ্রুতবেগে আগা মসিহ লেনে খন্দকার মোশতাক আহমদের বাসায় ছুটে গিয়েছে। তিন চীফ রেডিও স্টেশন পৌঁছুবার আগেই তাকে নিয়ে রশিদ সেখানে পৌঁছে যায়। মোশতাক সেখানে তিন বাহিনী প্রধানের আগমনের অপেক্ষায় বসে রইলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই মেজর ডালিম তাদের নিয়ে রেডিও স্টেশনে পৌঁছুলো। ঘড়ির কাঁটার সাথে তাল মিলিয়ে চলছে ঘটনা প্রবাহ। প্রতি মিনিটে ধাপে ধাপে পরিস্থিতির পরিবর্তন।

রেডিও স্টেশনের অভ্যন্তরে খন্দকার মোশতাক আহমদ তিন বাহিনী প্রধানকে সাদর অভিনন্দন জানালেন। সেনাবাহিনীর বীরত্বপূর্ণ কাজের জন্য কনগ্রাচুলেশনস জানালেন। অত্যন্ত হৃদ্যতাপূর্ণ পরিবেশে আলোচনা চললো। ঝানু পলিটিশিয়ান খন্দকার মোশতাক। তিনি প্রেসিডেন্ট পদ গ্রহণের পূর্বে শর্ত আরোপ করলেন। সশস্ত্র বাহিনী প্রধানরা তার প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করবেন। তত্ত্বাবধায়ক বেসামরিক সরকার গঠন করা হবে। যথাশীঘ্র ইলেকশন দেওয়া হবে। তবেই তিনি সিংহাসনে আরোহন করবেন। ফারুক রশিদের ট্যাংক ও আর্টিলারি সৈনিকবৃন্দ কর্তৃক ঘেরাও রেডিও স্টেশন। চারিদিকে অস্ত্রের ঝনঝনানি। ভেতরে ভীমরুলের ফাঁদে আটকে পড়া অসহায় তিন সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী প্রধান। উন্মুক্ত অস্ত্র কাঁধে ক্যু-মেজরদের দ্রুত পদচারণা।

তিন প্রধান সব কিছুই মেনে নিলেন। ঐ পরিস্থিতিতে এছাড়া তাদের করবারও আর কিছু ছিল না। তারা এক এক করে রেডিওতে রশিদ-ফারুক মনোনীত প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদের-এর প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেন। মোশতাকের পক্ষে তাহের উদ্দিন ঠাকুর খসড়া বানালেন। রেডিও বাংলাদেশ অত্যন্ত আনন্দের সঙ্গে সদর্পে বারবার তাদের আনুগত্য-ঘোষণা প্রচার করে চললো। তখন বেলা সাড়ে ১১টা।

অভ্যুত্থানের সাফল্যের পথে এ মুহূর্তটা ছিল একটি বিরাট 'Turning point'। এক অস্বস্তিকর অবস্থার অবসান। প্রকৃতপক্ষে ১৫ আগাস্টের সকাল ৫টা থেকে ১১টা, এই সময়টুকু ছিল অত্যন্ত নাজুক, ক্রান্তিলগ্ন। এই সময়ের প্রতিটি সিদ্ধান্ত ঘটনার মোড় এক খাত থেকে অন্য খাতে প্রবাহিত করছিল। সারা দেশের ভাগ্য ঝুলছিল অতি ক্ষীণ সূতোয়। তিন প্রধানের আনুগত্য ঘোষণা সকল অনিশ্চয়তার অবসান ঘটালো।

৪৬ ব্রিগেডে উল্লাস

সময় ১১-৪৫ মিনিট। ৪৬ ব্রিগেড হেড কোয়ার্টার। সি, জি, এস ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফ সেখানে বসে সমস্ত অপারেশন পরিচালনা করছেন। তার টেলিফোন এলো আমার কাছে। সেখানে পৌঁছুতে বললেন। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই সেখানে পৌঁছে দেখি ৪৬ ব্রিগেডের প্রায় সব অফিসারই সেখানে উপস্থিত। জমজমাট ব্যাপার।

সবাই উল্লাস করছে। কর্নেল শাফায়াত জামিলও সেখানে। চোখেমুখে তার বিজয়ের হাসি। যেন তার ব্রিগেড লঙ্কা জয় করেছে। আমার সাথে সজোরে হাত মিলিয়ে বলল, 'দেখলেন স্যার, ফ্রিডম ফাইটার্স হ্যান্ড ডান ইট্ বিফোর, অ্যান্ড দে হ্যাভ ডান ইট এগেইন।'

আমি তার উষ্ণ করমর্দন থেকে ছাড়া পেয়ে ব্রিগেডিয়ার খালেদের রুমে ঢুকলাম। তিনি ভীষণ ব্যস্ত। ইশারায় চেয়ার দেখিয়ে বসতে বললেন। ফোনে রক্ষীবাহিনীর কমান্ডারের সাথে সাভারে কথা বলছেন,'আরে বাবা, সারেন্ডার নাও। কাম্ হিয়ার অ্যান্ড সী এভরি ওয়ান ইজ হিয়ার। ইট্ ইজ অল্ ওভার।' তিনি রক্ষীবাহিনীর একজন ঊর্ধতন অফিসার সম্ভবত কর্নেল সাবেহ উদ্দিনের সাথে কথা বলছিলেন।

আমার সাথে একগাল হেসে খালেদ হাত মেলালেন। বললেন, 'হামিদ ভাই, স্টেশনের অবস্থা কেমন?' বললাম, 'লেটেস্ট খবর তো দেখছি এখানেই।' তিনি বললেন, 'ইট ইজ অল আন্ডার কন্ট্রোল। তবে সিচুয়েশন খুবই অনিশ্চিত। যে কোন কিছু ঘটে যেতে পারে। আপনি স্টেশন সিকিউরিটি প্ল্যান তাড়াতাড়ি তৈরি করে এসে আমার সাথে আলোচনা করুন।' আবার টেলিফোন এলো। এবার তিনি এয়ার ফোর্সের সাথে কথা বলছিলেন, দুটি ফাইটার জেট পাঠিয়ে সাভারে রক্ষীবাহিনীর উপর 'Show of Force' করতে বললেন। একই সাথে ফ্লায়িং ক্লাবের সাথে যোগাযোগ করে মেজর আমসা আমিন (বর্তমানে জেনারেল) ও ক্যাপ্টেন মুনীরকে ফ্লায়িং ক্লাবের একটি প্লেনে উড়ে গিয়ে সাভারে রক্ষী বাহিনীর লোকজনদের গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করতে বললেন। আরো বিভিন্ন নির্দেশ দিলেন।

বারান্দায় তুমুল কোলাহল। তার ব্যস্ততা দেখে আমি উঠে পড়লাম। শাফায়াতের অফিসে বসেই তিনি সার্বিক সিচুয়েশন কন্ট্রোল করছিলেন। কামরার বাইরে এসে বারান্দায় দেখি কালো ব্যাটল ড্রেসে মেজর ফারুক। কাঁধে তার স্টেনগান। মুখে তৃপ্তির হাসি। সবাই তার সাথে হাসিখুশি হাত মেলাচ্ছে। সবাই তার সাফল্যে অভিনন্দন জানাচ্ছে। কনগ্রাচুলেশন! কনগ্রাচুলেশন! আমার সামনে আসলো সে, হাত মেলালাম, বললাম, 'ফারুক, তোমার স্টেনগানটায় গুলি আছে বাবা, নাকি ফাঁকা?' বিরাট হাসি দিয়ে সে বলল, 'স্যার, এটাতে অবশ্যই আছে। তবে বিশ্বাস করুন, সকালে যে ট্যাংক নিয়ে বেরিয়েছিলাম, তাতে একটিও শেল্ ছিল না। একেবারে খালি।' বলেই সে হাসতে থাকল। আমি বললাম, 'তোমার ট্যাংকগুলো এখন কোথায়?' সে বলল, 'সবগুলো আমি ক্যান্টনমেন্টে ফিরিয়ে এনেছি। দেখুন গিয়ে।'

ততোক্ষণে রেডিওতে নিজ নিজ কণ্ঠে বারবার তিন বাহিনী প্রধানের আনুগত্য ঘোষণা হচ্ছে। তাদের সাথে বি. ডি. আর প্রধান মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান এবং পুলিশ প্রধানের আনুগত্য ঘোষণাও সদম্ভে প্রচার হতে লাগলো। সর্বত্র খুশির হিল্লোল।

হত্যা-পরবর্তী সমস্ত প্রোগ্রামের দায়িত্বে ছিল মেজর আব্দুর রশিদ। চতুর্দিকে ছোটাছুটি করে সে তার দায়িত্ব সুচারুরূপেই পালন করলো। এই সময় কোথাও সামান্যতম দুর্বলতা প্রকাশ পেলে তাদের অভ্যুত্থান ব্যর্থ হতো। মেজর রশিদ যখন স্থিতিশীল অবস্থা ফিরিয়ে আনতে গলদঘর্ম হয়ে ছুটছিলো, ফারুক তখন তার পিছনে এক ডজন ট্যাংক হাঁকিয়ে সারা শহর চষে বেড়াচ্ছে। ট্যাংকের ঘড়ঘড় শব্দে সারা শহর কেঁপে উঠছিল। সবাই ধরে নিয়েছিল এটা সামরিক বাহিনীর অভ্যুত্থানই বটে। অথচ প্রকৃতপক্ষে এটা সেনাবাহিনীর অভ্যুত্থান ছিল না। সেনাবাহিনীর মাত্র দুটি ইউনিটের ৯০০ শত সৈনিক এতে অংশগ্রহণ করে, তাও তারা কেউ কিছু না বুঝেই। এই অভ্যুত্থানের সাথে সেনাবাহিনী প্রধান বা অন্য কোন সিনিয়ার অফিসারও সরাসরি জড়িত ছিলেন না।

সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সমস্ত ব্যাপারগুলো একটির পর একটি এমন নাটকীয়ভাবে ঘটে গেল যা হিন্দির মারপিট মার্কা ছবির নাটককেও বুঝি হার মানায়!

মোশতাকের ট্যাংক মিছিল ও শপথ গ্রহণ

দুপুর বেলা জুম্মার নামাজের আগেই খন্দকার মোশতাক আহমদ বিরাট মিছিল সহকারে বঙ্গভবন পৌঁছুলেন। তার পতাকাবাহী গাড়ির আগে পিছে দুটি করে চারটি ট্যাংক, কয়েকটি সামরিক ট্রাক, জীপ, অনেকগুলো কার। রেডিও স্টেশন থেকে প্রেস ক্লাবের সামনে দিয়ে লম্বা বিজয় মিছিলটি শান-শওকতের সাথেই বঙ্গভবনে প্রবেশ করল। এমন অভিনব ট্যাংক মিছিল ইতিপূর্বে কেউ কখনও দেখেনি।

সবাই বঙ্গভবনে একত্রে জুম্মার নামাজ আদায় করে আল্লাহর কাছে শুকরিয়া আদায় করলেন। জুম্মার নামাজের পর তিন বাহিনী প্রধান, বি ডি আর এবং অন্যান্য সিভিল গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গের সামনে খন্দকার মোশতাক আহমদ শপথ গ্রহণ করলেন। উপস্থিত সবাই ছুটে গিয়ে তাকে অভিনন্দন জানালো। এরপর মোশতাক আহমদ তার নূতন মন্ত্রী সভার সদস্যদের শপথ গ্রহণ করান। প্রায় সবাই পুরাতন মাল। তিনি নূতন বোতলে পুরাতন মদ ভরে দিলেন। পুরাতন আওয়ামী লীগ মন্ত্রীসভার কয়েকজন বাদে সবাইকে নিয়েই নূতন মন্ত্রীসভা গঠন করলেন। সবাই খুশি।

শেখ সাহেবের লাশ তখনো ৩২ নং রোডের বাসার সিঁড়িতে পড়ে আছে। তার কথা সবাই ভুলেই গেছে। বঙ্গভবনে চলছে আনন্দ-উল্লাস, খানাপিনা!

দুপুরে আমার অফিসে বসে স্টেশনে সিকিউরিটি প্ল্যান বানাচ্ছিলাম। এমন সময় জেনারেল শফিউল্লাহর ফোন এলো। তিনি আমাকে তাড়াতাড়ি শহরের অবস্থাটা দেখে আসতে বললেন। ১৪৪ ধারা জারির প্রয়োজন আছে কি-না তাকে অবগত করতে বললেন। সেই সাথে ৩২ নম্বর রোডের অবস্থাটাও দেখে আসতে বললেন। আমি সিকিউরিটি প্ল্যানের একটা খসড়া দাঁড় করিয়ে আমার স্টাফ অফিসারকে মোসাবিদা করতে বলে জীপ নিয়ে শহরের দিকে ছুটলাম।

এয়ারপোর্ট রোড ধরে এগিয়ে যাচ্ছিলাম আমি। রাস্তা-ঘাট ফাঁকা। সবাই ভীত সন্ত্রস্ত। মোড়ে মোড়ে জটলা। ফাঁকা রাস্তা বেয়ে একটি মাত্র জীপই বীরদর্পে সশব্দে এগিয়ে যাচ্ছিল। আওলাদ হোসেন মার্কেট, ফার্মগেট দিয়ে যাওয়ার পথে বিভিন্নস্থানে আর্মি জীপ দেখে লোকজন হাত নেড়ে শ্লোগান তুললো, আল্লাহু আকবার! সেনাবাহিনী জিন্দাবাদ! একদিনেই এতো পরিবর্তন? অথচ গতকালও পরিস্থিতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন। কি অবাক কান্ড!

তবে আমার বুঝতে অসুবিধা রইলো না যে পরিবর্তিত অবস্থাকে সাধারণ মানুষ মেনে নিয়েছে। কোন বড় রকমের গন্ডগোল হওয়ার কোন আশঙ্কা নেই। আমি ১৪৪ ধারা জারির পক্ষে কোন যুক্তি দেখতে পেলাম না।

গ্রীন রোড ধরে ৩২ নম্বর রোডে গিয়ে পৌঁছুলাম। আশেপাশে রাস্তাঘাটে কোথাও লোকজন নেই। সবাই দরজা বন্ধ করে ঘরে বসে আছে। শেখ সাহেবের বাড়ির চতুর্দিকে পোশাকধারী সৈনিকদের আনা-গোনা। তারা বাড়ি ঘেরাও করে রেখেছে।

রক্তাক্ত বাড়ি

৩২ নম্বর রোডের মুখে ঢুকতেই প্রহরারত সৈনিকরা আমার জীপ আটকালো। আমার পরিচয় দিলে তারা ছেড়ে দিল। শেখ সাহেবের বাসার গেটে দাঁড়িয়ে মেজর পাশা ও মেজর বজলুল হুদা। পাশা এগিয়ে এসে অভ্যর্থনা জানালো। বাড়ির দেয়ালে বুলেটের ক্ষত-বিক্ষত দাগগুলোর দিকে তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এখানে যথেষ্ট ফায়ারিং হয়েছে না-কি?'

মেজর পাশা বললো, 'বলেন কি স্যার, হেভী ফায়ারিং! রীতিমত যুদ্ধ! বাসার ভেতর থেকেই তারাই আগে ফায়ার করে। দেখুন কতো হাতিয়ার।'

আমাকে সে গেটের পাশে লেকের ধারে সাজিয়ে রাখা হাতিয়ারগুলোর দিকে নিয়ে গেল। দেখলাম ২০/২৫ টা রাইফেল, স্টেনগান, মেশিনগান, গ্রেনেড, এমনকি একটি ভারি মেশিনগানও রয়েছে। আমি মনে মনে ভাবলাম, এতগুলো ভারি অস্ত্র দিয়ে তো অনেকক্ষণ তারা প্রতিরোধ করতে পারতো। এখন মনে হচ্ছে, ওগুলো ছিল বাসায় ডিউটিরত পুলিশদের কাছ থেকে সিজ করা অস্ত্রশস্ত্র। পাশাকে বললাম, 'ভেতরে গিয়ে একটু দেখে আসতে চাই।' সে তৎক্ষণাৎ মেজর হুদাকে বলল আমাকে ভেতরে নিয়ে যেতে।

হুদা প্রথমেই নিয়ে গেল নিচতলায় রিসিপশন রুমে। সেখানে শেখ কামালের মৃতদেহ টেবিলের পাশে একগাদা রক্তের মাঝে উপুড় হয়ে পড়ে আছে। একটা টেলিফোনের রিসিভার টেবিল থেকে ঝুলছিল। মনে হল যেন শেষ মুহূর্তে কাউকে ফোন করতে চাইছিলেন শেখ কামাল। একটা হাত তার ওদিকেই ছিল। টেবিলের

পাশে আর একটি মৃতদেহ। একজন পুলিশ অফিসার। প্রচুর রক্তক্ষরণেই দুজন মারা গেছেন। কামালের ভাঙ্গা চশমা পাশে পড়েছিল। মনে হলো কামরার ভেতর থেকেই দুজন ফাইট করছিলেন। গোলাগুলিতে জানালার ভাঙ্গা কাঁচ চতুর্দিকে ছড়িয়ে।

এরপর আমরা দু-তলায় উঠতে পা বাড়ালাম। সিঁড়ির মুখেই চমকে উঠলাম। সিঁড়িতেই দেখি পড়ে আছেন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান। আমার নিজের চোখকেই বিশ্বাস হচ্ছিলো না যে সিঁড়ির ওপরে এভাবে একজন রাষ্ট্রপ্রধানের দেহ পড়ে থাকতে পারে! তাঁর পরনে ছিল সাদা পাঞ্জাবী এবং চেক লুঙ্গি। পাশে পড়ে আছে তাঁর ভাঙ্গা চশমা। তাঁর দেহ সিঁড়ির ওপরে এমনভাবে পড়েছিল যেন মনে হচ্ছিলো সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে হঠাৎ পা পিছলে পড়ে গেছেন। আমার মনে হচ্ছিল তিনি ঘুমিয়ে আছেন, এখনই উঠে দাঁড়াবেন। কারণ তাঁর মুখে কোন রকমের আঘাতের চিহ্ন ছিল না। চেহারা ছিল সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, সৌম্য, শান্ত। তাঁর বুকের অংশটুকু ছিল ভীষণভাবে রক্তাক্ত। মনে হলো ব্রাশ লেগেছে। আমি তার বুকের কাছে মাথা নিচু করে দেখতে চেষ্টা করলাম। কোথায় গুলি লেগেছে, কিন্তু বুক ভরা রক্তের আবিরে কিছুই বোঝা গেল না। তার বাম হাতটা ছিল বুকের উপর ভাঁজ করা, তবে তর্জনী আঙুলটা ছিড়ে গিয়ে চামড়ার টুকরার সাথে ঝুলছিল। তার দেহের অন্য কোন অঙ্গে তেমন কোন আঘাত দেখিনি। সারা সিঁড়ি দিয়ে রক্তের প্রবল বন্যা। কোনমতে তার বিশাল দেহ ডিঙিয়ে দোতলায় গেলাম। সিঁড়ির মুখেই ঘরটাতে দেখি বেগম মুজিবের দেহ দেউড়ির উপর উপুড় হয়ে পড়ে আছে। তার গলার হারটা ঢুকে আছে মুখের মধ্যে। মনে হলো স্বামীর উপর গুলির শব্দ শুনে তিনি ছুটে আসছিলেন। কিন্তু দরজার মুখেই গুলিবিদ্ধ হয়ে দেউড়িতে লুটিয়ে পড়েন। তার দেহ অর্ধেক বারান্দায়, অর্ধেক ঘরের ভেতরে। তাকে পাশ কাটিয়ে ভেতর প্রবেশ করলাম। কামরার মেঝেতে এক সাগর রক্ত থপথপ করছিল। আমার বুটের সোল প্রায় অর্ধেক ডুবে যাচ্ছিল। বিধ্বস্ত পরিবেশ। রক্তাক্ত কামরার মধ্যে পড়ে আছে কয়েকটি লাশ। বাম পাশেরটি শেখ জামাল। তার দেহের ক্ষতবিক্ষত অবস্থা দেখে মনে হলো কামরার ভেতরে বোধ হয় গ্রেনেড নিক্ষেপ করা হয়। মিসেস রোজী জামাল সদ্য বিবাহিতা, হাতে তাজা মেহেদীর রঙ। ব্রাশ অথবা গ্রেনেডের আঘাত সরাসরি তার মুখে লেগেছিল।

ভাগ্যিস তার প্রিয়জন কাউকে তার চেহারা দেখতে হয়নি। পাশে মিসেস সুলতানা কামাল। কিছুদিন আগে ক্রীড়াঙ্গণের প্রিয়দর্শিনী এই গোল্ডেন গার্লকে স্টেডিয়ামে দেখেছি ছুটাছুটি করতে। প্রচুর রক্তক্ষরণে এখন তার চেহারা সম্পূর্ণ বিবর্ণ, শুকনো।

তার কোল ঘেঁষে ছোট রাসেলের মৃতদেহ। বড়ই করুণ দেখাচ্ছিলো তার মুখখানি। তার মাথার খুলির পিছন দিক একেবারে থেঁতলে যায়। জানিনা কি অপরাধ করেছিল এই শিশুটি। এরপর কামরা থেকে বেরিয়ে গিয়ে পাশে আরও দুটি কামরায় ঢুকলাম। সবগুলোই ছিল খোলা। প্রতিটি ঘরেই দামী দামী জিনিসপত্র। রাষ্ট্রপতির পরিবার। মাত্র কদিন আগেই দু'দুটি বিয়ে হয়ে গেছে ঐ বাড়িতে, কামাল ও জামালের। আনন্দ মুখর আনন্দ-ভবনটি এখন নিরব নিথর।

আমরা তিন তলায় যে ঘরে শেখ সাহেব থাকতেন সেখানে গেলাম। সেখানে তার পালঙ্ক বিছানা সাজানো গোছানো। খাটের পাশে সুন্দর টেলিফোন সেট সবই আছে। নেই শুধু রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমান। ধীরে ধীরে নেমে এলাম নিচে। মেজর হুদাকে বললাম মৃত দেহগুলোকে সাদা কাপড় বা চাদর দিয়ে ঢেকে দিতে। নিচের তলার একটি বাথরুমে শেখ নাসেরের রক্তাপ্লুত মৃতদেহ, চেনাই যাচ্ছিল না। তিনি মাত্র আগের দিনই খুলনা থেকে ঢাকায় এসেছিলেন, বুঝি মৃত্যুর আহ্বানে সাড়া দিতে।

বাড়ির পিছনে আঙিনায় একটি লাল গাড়ির পেছনের সিটে হেলান দিয়ে বসে কর্নেল জামিল উদ্দিনের প্রাণহীন দেহ। তার ঠিক কপালে বুলেট লেগেছিল। কপালে রক্ত জমাট হয়ে আছে, ঠিক যেন একটি লাল গোলাপ। বিদ্রোহীরা তাকে বাড়ির দিকে অগ্রসর হতে মানা করেছিল। কিন্তু তাদের কথা না মেনে তিনি গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে আসেন। কাছে থেকে নেয়া বুলেটের একটি আঘাত তৎক্ষণাৎ তাকে ধরাশায়ী করে। জানা যায় একজন অফিসারই তাকে শুট করে। সম্ভবতঃ মেজর নূর।

বাড়ির ভেতর প্রচুর সেপাই ঢুকে পড়েছিল। প্রত্যেকটি রুমই ছিল খোলা। দু'দুটো বিয়ের প্রচুর দামী জিনিসপত্র ও উপহার সামগ্রী। আমি হুদাকে বললাম কামরাগুলো লক করে দিতে, তা না হলে জিনিসপত্র চুরি হয়ে যেতে পারে। হুদা তখনই চিৎকার করে তার সৈনিকদের ভেতর থেকে বেরিয়ে আসতে বললো। তারা আমাদের পেছনে পেছনে ভিতরে ঢুকে পড়েছিল। সৈনিকদের পায়ে পায়ে সারা বাড়িতে রক্তের ছাপ ছড়িয়ে পড়েছিলো।

মনের ভেতরে যথেষ্ট ব্যথা-বেদনা নিয়ে বেরিয়ে এলাম। বাড়িটা দখল করার জন্য এতগুলো নিরীহ প্রাণ অকালে ঝরে পড়লো, এতো রক্তপাত হলো। একটি বিরাট পরিবারের হাসিখুশী চিরদিনের জন্য স্তব্ধ হয়ে গেলো। এরকম করুণ রক্তাক্ত দৃশ্য আমার দীর্ঘ সৈনিক জীবনে আর কখনো দেখিনি। আমার গাড়ি ডেকে দ্রুত ফিরে চললাম ক্যান্টনমেন্টে। পিছন থেকে শিশু রাসেলের করুণ চাহনি বারবার আমাকে পিছু টানছিলো।

৩২ নং রোড থেকে ফিরে আমি স্টেশন হেড কোয়ার্টার থেকে বঙ্গভবনে জেনারেল শফিউল্লাহকে জানালাম ১৪৪ ধারা জারির কোন দরকার নেই। কোন রকম গন্ডগোলের আশঙ্কা কোথাও নেই। সব ঠিক।

ক্যান্টনমেন্টে দেখা গেল সবাই হাসিখুশি। কেউ দুঃখিত নয়। উর্দিপরা জ্ঞাতি ভাইদের দ্বারা একটি বিরাট অ্যাডভেঞ্চার সংঘটিত হয়েছে। সফল অ্যাডভেঞ্চার। সবাই এটাকে স্বাভাবিক ভাবেই গ্রহণ করেছে। অবশ্য তারা কেউ ৩২ নং রোডের করুণ রক্তাক্ত দৃশ্য দেখেনি।

বিকাল বেলায়ই আর্টিলারি ও ল্যান্সারের কিছু ট্যাংক ও কামান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে অবস্থান নেয়। কয়েকটি ট্যাংক ও কামান একেবারে বঙ্গভবনের ভেতরে এনে স্থাপন করা হল। সন্ধ্যা নামার আগে আগেই ঢাকা শহরে ও ক্যান্টনমেন্টের পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়ে আসে।

সারাদিন রেডিওতে একের পর এক ঘোষণা ও নির্দেশ প্রচার চলছিল। চলছিল মার্চ গান, গজল ইত্যাদি। সারাদিন কাজকর্ম ফেলে সবাই ঘরে বসে কেবল রেডিওই শুনছিল। বাইরে ছিল কারফিউ। রেডিও মারফত তাৎক্ষণিকভাবে রাষ্ট্রীয় কর্মকান্ড সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছিল. এমনটি আর কখনও দেখা যায়নি। নূতন প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদ ইতিমধ্যে বঙ্গভবনে তশরিফ নিয়ে গেছেন। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়ে তিনি সেখান থেকেই বিভিন্ন নির্দেশ ও ফরমান দিচ্ছেন। বঙ্গভবনই এখন সকল কর্মকান্ডের কেন্দ্রবিন্দু। তার সাথে কোমরে পিস্তল ঝুলিয়ে মেজর আবদুর রশিদ ও ফারুক রহমান।

তিন বাহিনী প্রধানরা সবাই বঙ্গভবনে। জেনারেল শফিউল্লাহকে সারাক্ষণই বঙ্গভবনে অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে ডুবিয়ে রাখা হলো। প্রকৃতপক্ষে তাকে ১৫ থেকে ১৭ অগাস্ট পর্যন্ত এক কাপড়ে এক নাগাড়ে সুকৌশলে বঙ্গভবনে এনগেজড (নাকি আটক!) রাখা হয়, যাতে কোনভাবে তার দ্বারা অপ্রত্যাশিত কোন ঘটনার সৃষ্টি না হয়। তাকে ছায়ার মত অনুসরণ করতে থাকেন জিয়াউর রহমান। শফিউল্লাহ ব্যাপারটা বুঝতে পারলেও কিছু করতে পারছিলেন না। ফারুক-রশিদের অবশ্য এমনিতেই তাকে সরিয়ে দেবার প্ল্যান ছিল এবং চূড়ান্তভাবে তাকে ২৪ অগাস্ট থেকে অবসর দেয়া হয়। এভাবে জোর করে অবসর দেয়ায় শফিউল্লাহ খুবই অপমানিত বোধ করেন।

১৫ অগাস্ট ভোর বেলা ৪-৩০ মিনিটে ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের উত্তর প্রান্ত থেকে দুটি শক্তিশালী যান্ত্রিক ইউনিটের অগ্রযাত্রার মধ্যে দিয়ে ঝটিকার বেগে যে রক্তাক্ত অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়, ১২ ঘন্টার ব্যবধানে ঐ দিন বিকাল ৪-৩০ মিনিটের মধ্যেই তার সফল পরিসমাপ্তি ঘটলো।

সন্ধ্যা নামার সাথে সাথেই নূতন রাষ্ট্র, নূতন রাষ্ট্রপতি, নূতন মন্ত্রিসভা, নূতন প্রশাসন। সর্বত্র জয়ধ্বনি। অদ্ভুত ব্যাপার। অবিশ্বাস্য কান্ড! মাত্র বারো ঘন্টার ব্যবধানে কি বিরাট পরিবর্তন! উত্থান পতন!

সন্ধ্যাবেলা ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে অন্ধকার নামার সাথে সকল নাটকীয়তার অবসান ঘটল। সারাদিন ধরে সর্বত্র বিরাজ করছিল টেনশন আর উত্তেজনা। অফিসার ও সৈনিকগণ মিলিটারি অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পরিবর্তন স্বাভাবিক ভাবে গ্রহণ করেছে। বরং শাফায়াত জামিলের ৪৬ ইনফেন্ট্রি ব্রিগেডের সৈনিকবৃন্দের মধ্যে উল্লাস আনন্দের মাত্রা ছিল স্বাভাবিকের চেয়ে কিছু বেশি। রাতে টেলিভিশনে নূতন প্রেসিডেন্টের সাথে নূতন মন্ত্রীগণ, আর ফারুক রশিদ প্রমুখদের সাথে সবার হাসিখুশি চেহারা ভেসে উঠল পর্দায়। উষ্ণ করমর্দন। অভিবাদন। অভিনন্দন। তবে কেউ কেউ বেশ চিন্তিতও ছিলেন।

সন্ধ্যায় নব-নিযুক্ত রাষ্ট্রপতি খন্দকার মোশতাক আহমদের দেশবাসীর প্রতি ভাষণঃ

বিসমিল্লাহির রাহমানের রাহিম

আস্‌সালামু আলায়কুম

প্রিয় দেশবাসী ভাই ও বোনেরা, এক ঐতিহাসিক প্রয়োজনে বাংলাদেশের সাড়ে সাত কোটি মানুষের সত্যিকার ও সঠিক আকাঙ্খাকে বাস্তবে রূপদানের পূর্ণ দায়িত্ব সামগ্রিক ও সমষ্টিগতভাবে সম্পাদনের জন্য পরম করুণাময় আল্লাহতায়ালা ও বাংলাদেশের গণমানুষের দোয়ার উপর ভরসা করে রাষ্ট্রপতি হিসাবে সরকারের দায়িত্ব আমার উপর অর্পিত হয়েছে। বাংলার মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের বজ্রকঠিন দায়িত্ব সম্পাদনের পথ সুগম করার জন্য বাংলাদেশের সেনাবাহিনী সত্যিকারের বীরের মত অকুতোভয় চিত্তে এগিয়ে এসেছেন। বাংলাদেশ বিমান বাহিনী, নৌ বাহিনী, বাংলাদেশ রাইফেলস, রক্ষীবাহিনী এবং পুলিশ বাহিনী সরকারের প্রতি অকুণ্ঠ আনুগত্য ও আস্থা প্রকাশ করেছেন। এরা সবাই একযোগে কাজ করে যাচ্ছেন।

“সকলের প্রতি বন্ধুত্ব এবং কারো প্রতি বিদ্বেষ নয়” এই নীতির রূপ-রেখার মধ্যে আমরা শান্তি ও প্রগতির পথে আমাদের অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখবো....।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।'

রাতের অন্ধকারে

সারাদিন বিভিন্ন ঘটনার আবর্তে পড়ে দেহমন ছিল ক্লান্ত। তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া সেরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রাত তিনটার দিকে আমার বেডরুমে টেলিফোন সেটটি গর্জে উঠল, ক্রিং ক্রিং ক্রিং। ক্রমাগত বেজেই চললো। আমার স্ত্রী বাধা দিয়ে অনিশ্চয়তার সময়ে গভীর রাতে টেলিফোন ধরতে মানা করলো। আমি তবুও ফোন ধরলাম। অপরপ্রান্তে মেজর আবদুল মতিন (পরবর্তীতে ব্রিগেডিয়ার) তিনি বললেন, 'আমি বঙ্গভবন থেকে বলছি, নূতন রাষ্ট্রপতি এবং সেনাবাহিনী ও অন্যান্য বাহিনীর প্রধানসহ অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা সবাই এখানে আছেন। আপনাকে যে মেসেজ দেয়ার জন্য আমাকে বলা হয়েছে তা হলো, আগামীকাল সূর্য ওঠার আগেই, শেখ সাহেবের বাসার সমস্ত লাশগুলি বনানী গোরস্থানে দাফন করার ব্যবস্থা নিতে হবে। 'আমি জিজ্ঞাসা করলাম, এ অর্ডারটা কে দিলেন?' সে বললো, 'এখানে তো রাষ্ট্রপতি থেকে শুরু করে সকল উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা আছেন, আপনার কোন সন্দেহ থাকলে আপনি গাড়ি নিয়ে বঙ্গভবনে এসে যান। কিন্তু তাতে আপনার সময় নষ্ট হবে। আমি আপনাকে বলছি, এটা হাইয়েস্ট কোয়ার্টারের অর্ডার।'

অসময়ে টেলিফোন উঠানোর জন্য আমি নিজেকে অভিসম্পাত দিলাম। মতিনের কণ্ঠস্বর বিরক্তকর হলেও মনে হলো বঙ্গভবনে মোশতাকের খাস কামরাতে বসেই যেন সে নির্দেশ বিতরণ করছিল।

কিছুক্ষণ পরে আবার মেজর মতিনের টেলিফোন, 'স্যার, আরো কিছু নির্দেশ। শেখ মনি, আবদুর রব সেরনিয়াবাতসহ অন্যান্য যারা ঐ ঘটনায় মারা গিয়েছেন, তাদের বাসা থেকেও মৃতদেহগুলো কালেক্ট করতে হবে এবং তাদের লাশ বনানী গোরস্থানে দাফন করতে হবে। তবে শেখ সাহেবের লাশ শুধু বাসায় থাকবে

বনানীতে দাফন করা হবে না, স্থান পরে জানানো হবে।' সময় খুব বেশি হাতে নেই। ১ নং সাপ্লাই ব্যাটালিয়ন ছিল ডিউটি ব্যাটালিয়ন। স্টেশন হেড কোয়ার্টারে আমার ডিউটি অফিসারকে তৎক্ষণাৎ তাদের জড়ো করতে নির্দেশ দিলাম এবং সংশ্লিষ্ট সবাইকে টেলিফোনে মেসেজ দিতে বললাম। আমি তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে ষ্টেশন হেড কোয়ার্টারে পৌঁছে দেখি সেখানে অনেকেই এসে গেছে। আমি তাদের দু'টো গ্রুপ করলাম। একটা গ্রুপকে ট্রান্সপোর্টসহ শেখ সাহেবের বাসায় পাঠালাম। আর একদলকে পাঠালাম বনানী গোরস্থানে গিয়ে কবর খুঁড়তে। ৩০ জন সৈনিক একজন সুবেদারের অধীনে বনানী কবরস্থানে যায়। তাদের কমান্ডিং অফিসার কর্নেল রব তখনও এসে পৌঁছাননি। টেলিফোনে তাকে নির্দেশ শুনালাম। এরপর আমি নিজেই শেখ সাহেবের বাসার উদ্দেশে রওয়ানা দিই।

সেদিন অমাবশ্যা ছিল কি-না জানি না, রাত ছিল গভীর অন্ধকার। দু'হাত দূরেও কিছু দেখা যাচ্ছিলো না। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন। মধ্যরাতে ফাঁকা রাস্তা দিয়ে আমার জীপ তীব্র আলো ছড়িয়ে অন্ধকার ভেদ করে ক্যান্টনমেন্ট থেকে ৩২ নম্বর রোডের দিকে ছুটে চলল। হঠাৎ কেন জানি গভীর রাতের অন্ধকারে আমি রাস্তায় চোরাগুপ্তা আক্রমণের আশংকা করলাম। আমার সাথে তিনজন সৈনিককে তাই রাইফেল লোড করে সাবধান থাকতে বলে দিলাম। যাই হোক নির্বিঘ্নেই আমরা ৩২ নং রোডে পৌঁছে গেলাম। গেটের বাইরে থাকতেই মেজর হুদার কর্কশ কণ্ঠ কানে ভেসে এলো। সে সৈনিকদের লাইন করিয়ে কড়া ভাষায় গালাগালি দিচ্ছিলো, কারণ তারা সুযোগ পেলেই ভেতরে ঢুকে এটা ওটা হাতড়ে নিচ্ছিল।

আমার পৌঁছুবার আগেই শেখ সাহেবের পরিবারের সবগুলো লাশ কফিন-বন্দী করে সাপ্লাই ব্যাটালিয়নের ট্রাকে তুলে আমার আগমনের জন্য অপেক্ষা করছিল। শুধু শেখ সাহেবের লাশ কফিনবন্দী করে বারান্দায় এক কোণে একাকী ফেলে রাখা হয়েছিল। আমি সুবেদার সাহেবকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'এটা কি শেখ সাহেবের লাশ?' তিনি স্মার্টলি জবাব দিলেন, 'জ্বি স্যার, ওটা শেখ সাহেবের। আমি নিজে চেক করে রেখেছি। সব ঠিক।' কেন জানি আমার একটু খটকা লাগলো। কৌতূহলবশতঃ বললাম, 'কফিনের ঢাকনাটা খুলুন, আমি চেক করবো।' তারা বড়ই অনিচ্ছায় হাতুড়ি বাটাল এনে আবার কফিনটি খুললেন। কি আশ্চর্য! দেখা গেল ওটা শেখ সাহেবের লাশ নয়, শেখ নাসেরের লাশ। সুবেদার সাহেব খুব ঘাবড়ে গেল। তাকে বকাঝকা করলাম। আসলে শেখ নাসেরকে দেখতে তার বড় ভাই শেখ মুজিবের মতই। আর এতেই সুবেদার সাহেবের ঘটে বিভ্রান্তি।

আমি এবার ট্রাকে উঠে সবগুলো কফিনের ঢাকনা খুলে ম্যাচ বক্সের কাঠি জ্বালিয়ে শেখ সাহেবকে খুঁজতে লাগলাম। অন্ধকার রাত। কিছুই দেখা যাচ্ছিল না। অবশেষে ট্রাকের এক অন্ধকার কোণে শেখ সাহেবকে পাওয়া গেল। একটি কফিনের ঢাকনা খুলতেই বরফের স্তূপের ভেতর থেকে তাঁর দীপ্ত, অক্ষত, সুপরিচিত মুখখানি বেরিয়ে এলো। সাদা চাদরে ঢাকা বুকের সমস্ত অংশ তখনো রক্তে রাঙ্গা। তাঁর কফিনের ঢাকনা বন্ধ করে সম্মানের সাথে তাঁকে নিচে নামিয়ে বারান্দায় স্থাপন করা হলো। বারান্দা থেকে শেখ নাসেরের কফিন ট্রাকে নিয়ে তুলে দেয়া হলো। আমি সবগুলো কফিন নিজ হাতে কলম দিয়ে নাম লিখে মার্ক করে দিলাম। লাশ-বদল বিভ্রাটের দরুণ বেশ কিছু সময় নষ্ট হয়ে গেল। কফিনগুলোসহ ট্রাকটি বনানী রওয়ানা করিয়ে দিয়ে এবার আমি জীপ নিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে শেখ মনির বাসার দিকে ছুটলাম। মেজর আলাউদ্দিনকে পাঠালাম আবদুর রব সেরনিয়াবাতের বাসায়। তখন ভোর ৪-৪৫ মিনিট।

শেখ মনির বাসায় পৌঁছে ঘরের ভিতর ঢুকে দেখি সব ফাঁকা, কেউ নেই। এমন কি কোন মৃতদেহও নেই। অথচ দরজা সব খোলা। বাড়ির জিনিসপত্র সবই যথাস্থানে পড়ে আছে, যেন জনমানবশূন্য ভুতুড়ে বাড়ি। আমি ডাকাডাকি করলাম। কোনও সাড়াশব্দ নেই। তবে ঘরের ভিতর যে একটি রক্তক্ষয়ী প্রলয় ঘটে গেছে তা স্পষ্টই বুঝা গেল। কাছেই পুলিশ থানা। থানায় গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, শেখ মনির লাশ সম্পর্কে তারা কিছু জানে কিনা। তারা বলল, গোলাগুলির পর কিছু সৈন্য এসে বোধহয় ডেডবডিগুলো মর্গে নিয়ে গেছে। ইতিমধ্যে আলাউদ্দিনও সেরনিয়াবাত সাহেবের বাসায় কোন লাশ না পেয়ে ফিরে এসেছে। অগত্যা আমি জীপ হাঁকিয়ে দ্রুত মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পৌঁছুলাম। সেখানে ডিউটিরত পুলিশ ইন্সপেক্টর এরশাদ বললেন, মর্গেই সব লাশ পড়ে আছে। লাশগুলো বের করে দেবার জন্য মর্গের ডোমকে ডাকা হলো। ডোম এসে দরজা খুললে দেখা গেল মর্গে ১৫ দিনের পুরানো পচা গলিত অনেকগুলো লাশ একসাথে স্তুপ হয়ে আছে। ওগুলোর মধ্যে থেকেই সেরনিয়াবাত ও শেখ মনির পরিবারের সদস্যদের মৃতদেহগুলো সনাক্ত করা হয়। পুলিশ অফিসাররাই এগুলো সনাক্ত করেন। এতগুলো লাশ এক সাথে চাপাচাপি করে থাকায় ১২ ঘন্টায়ই একেবারে পচে গিয়েছিল। ভীষণ দুর্গন্ধ বেরুচ্ছিল। মরা মানুষের লাশ এত দুর্গন্ধময় হতে পারে, আমার ধারণাই ছিল না। পুলিশ অফিসারতো 'ওয়াক থু' করে বমিই করে বসলেন। লাশগুলো ট্রাকে উঠিয়ে বনানী গোরস্থানে নিয়ে যেতে বলি। আমি সেখান থেকে দ্রুত জীপ চালিয়ে বনানী ছুটলাম।

চারিদিকে বিভৎস দৃশ্য দেখে দেখে আমার মাথায় বারবার গন্ডগোল বেঁধে যাচ্ছিল। কয়েকবার বমি করার উপক্রম হলো। গভীর রাতে এরকম একটি অপ্রীতিকর কাজে জড়িয়ে ফেলার জন্য বারবার মেজর মতিনকে অভিসম্পাত দিতে লাগলাম। সাপ্লাই ব্যাটালিয়নের সৈনিকরা একটানা কাজ করে ১৮ টি কবর খুঁড়ে রেখে ছিল। শেখ সাহেবের পরিবারের লাশগুলো আগে দাফন করা হয়। তাদেরকে প্রথম সাতটি কবরে সম্মানের সঙ্গে দাফন করা হয়। এ সময় ব্যাটালিয়নের একজন সিনিয়র সুবেদার উপস্থিত ছিলেন। তাদের কমান্ডিং অফিসার কর্নেল রবও ছিলেন। তাদের আরো দু-একজন অফিসার ছিল। আমি কাউকে ঠাহর করতে পারছিলাম না। অত্যন্ত বৈরী পরিবেশ ও টেনশনের মধ্যে তারা দাফন কার্য্য সমাধা করে।

শেখ পরিবারের সাতজন সদস্যের কবর আছে বনানীতে। প্রথম কবরটা বেগম মুজিবের। দ্বিতীয়টা শেখ নাসেরের। তৃতীয়টা শেখ কামালের। চতুর্থ কবর মিসেস

কামালের। পঞ্চম কবর শেখ জামালের। ষষ্ঠ কবরে মিসেস জামাল এবং সপ্তম কবরে শায়িত আছে মাস্টার রাসেল।

সব মিলে ওখানে ১৮ টি কবর রয়েছে। ১৩ নং কবরটি শেখ মনির। ১৪ নং বেগম মনির। ১৭ নং কবরে শায়িত রয়েছেন জনাব সেরনিয়াবাত। বাকিগুলো শেখ মনি ও জনাব সেরনিয়াবাতের বাসায় অন্যান্য যারা মারা যান তাদের কবর।

লাশগুলো দাফনের পর আমি আমার অফিস থেকে গোরস্থানে ফিরে এসে এক এক করে নামগুলো আমার অফিস-প্যাডে লিপিবদ্ধ করি। রেকর্ডটি বহুদিন ধরে আমার কাছে রক্ষিত রয়েছে। এছাড়া আর কোথাও এই সমাধিগুলোর রেকর্ড নেই।

প্রয়াত রাষ্ট্রপতির দাফন

সারারাত ভূতের মতো এখানে ওখানে ছুটাছুটি করে। আমার মাথা বনবন করছিল। বনানীতে শেখ পরিবার, শেখ মনি ও সেরনিয়াবাত পরিবারের দাফন সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। যদিও সৈনিকদের সূর্য ওঠার কিছু পরও কাজ করতে হয়েছিল। আমি ক্যান্টনমেন্ট বোর্ড অফিসারকে নির্দেশ দিলাম তাড়াতাড়ি ক'জন মালী পাঠিয়ে যেন কবরগুলো সুন্দরভাবে ড্রেসিং করে দেয়।

আমি আমার অফিসে বসে এক ধাপ চা পান করছিলাম। বঙ্গভবন থেকে টেলিফোনে আবার মেসেজ পাঠানো হলো, শেখ সাহেবের ডেডবডি টুঙ্গীপাড়া পাঠানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। একটি এয়ারফোর্স হেলিকপ্টারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। রাষ্ট্রপতিকে টুঙ্গীপাড়া দাফনের যাবতীয় ব্যবস্থা করা হয়েছিল বঙ্গভবন থেকে। আমাকে বঙ্গভবনের টেলিফোন ভীতি পেয়ে বসলো। আমি জীপ নিয়ে অফিস থেকে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লাম এবং খামাকাই এখানে ওখানে ঘুরাফেরা করে সময় কাটাতে লাগলাম।

আর্মি অর্ডিন্যান্সের একটি প্লাটুন মেজর মহিউদ্দিনের নেতৃত্বে প্রস্তুত রাখা হলো। প্রয়াত রাষ্ট্রপতি হেলিকপ্টারের পাইলট ছিলেন ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট শামসের আলী (বর্তমানে এয়ার কমোডর)। তারা তেজগাও এয়ারপোর্ট থেকে বেলা আড়াইটা নাগাদ শেখ সাহেবের লাশ নিয়ে টুঙ্গীপাড়ার উদ্দেশ্যে আকাশে পাড়ি জমালো। হামলার আশঙ্কায় হেলিকপ্টার অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত ছিল। আকাশযানটি টুঙ্গীপাড়ার আকাশে পৌঁছুলে আশেপাশের লোকজন ভয়ে গ্রাম ছেড়ে পালিয়ে যায়। ওখানে আগেই পুলিশ পাঠাবার জন্য সংবাদ দেয়া হয়েছিল। মেজর মহিউদ্দিন পুলিশের সহায়তায় কোনক্রমে ১৫/২০ জন লোক জানাজার জন্য জড়ো করতে সক্ষম হয়েছিল। একজন স্থানীয় মৌলভীকে ডেকে এনে শেখ সাহেবের লাশ গোসল করানো হয়। তার গায়ে ১৮ টি বুলেটের দাগ দেখতে পাওয়া যায়। গোসল শেষে পিতার কবরের পাশেই তাঁকে চিরনিদ্রায় শায়িত করা হয়।

সূর্যিমামা পশ্চিম গগনে হেলে গিয়ে বিদায়ের প্রস্তুতি নিচ্ছিলো। তার আগেই দাফন কার্য শেষ করে শামসের হেলিকপ্টার নিয়ে আকাশে উড়লো।

জাতির জনককে শেষ বিদায় জানাতে যে কোন কারণেই হোক, টুঙ্গীপাড়ার লোকজন সেদিন ভিড় করেনি। যে ব্যক্তি সারা জীবন বাঙালি জাতির স্বাধীন সত্তার জন্য সংগ্রাম করে গেলেন, তাঁকে শেষ বিদায় জানানো হলো অতি নিরবে, নিঃশব্দে, সুদূর টুঙ্গীপাড়ার একটি গ্রামে।

ভারতীয় হস্তক্ষেপ

অগাস্ট অভ্যুত্থানের পর পরই ভারতীয় বাহিনীর হস্তক্ষেপের যথেষ্ট আশঙ্কা দেখা দেয়। ভারত-বাংলাদেশ চুক্তি অনুযায়ী আভ্যন্তরীণ গোলযোগে ভারতের হস্তক্ষেপ করার একটি বিতর্কিত ধারা রয়েছে। ভারত কেন হস্তক্ষেপ করলো না? বিভিন্ন সূত্রমতে তারা আওয়ামীলীগ নেতৃবৃন্দের আহবানের অপেক্ষায় ছিল। কিন্তু কেউ তা করেনি। নেতারা ছিলেন অন্তরীণ। তবে একাত্তর আর পঁচাত্তর এক ছিল না। পঁচাত্তরে বাঙলাদেশের জনমত ছিল সম্পূর্ণ ভারতের প্রতিকূলে। এসব উপলব্ধি করেই তারা ভুল পথে পা বাড়ায়নি বলে মনে হয়।

ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর দিল্লী থেকে ছুটে আসেন এবং ভারতীয় আশঙ্কার কথা তুলে ধরেন। তাকে বলতে বলা হয়, ভারতীয় এক ডিভিশন মার্চ করলে, চীন পাঁচ ডিভিশন সৈন্য মার্চ করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। ব্রিগেডিয়ার মঞ্জুর হঠাৎ করে ১৫ অগাস্ট দিল্লী থেকে ঢাকা চলে আসেন। তিনি কিভাবে, কার নির্দেশে ঐদিন ঢাকা আসেন, তা আজো কেউ জানে না। পরদিনই তাকে ফেরত পাঠানো হয়। ধারণা করা হয়, জিয়ার ডাকেই তিনি আসেন।

যা হোক, অতি দ্রুত স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসায় ভারতীয় হস্তক্ষেপের আশঙ্কা দূরীভূত হয়; তা না হলে আর একটি রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে বাংলাদেশ জড়িয়ে পড়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল।

১৫ অগাস্ট পরবর্তী ঢাকা ক্যান্টনমেন্টের অবস্থা শান্ত হয়ে এলো বাহ্যিকভাবে, কিন্তু অশান্ত হয়ে উঠল ভেতরে ভেতরে। ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দু তখন বঙ্গভবন। নূতন প্রেসিডেন্ট খন্দকার মোশতাক আহমদ সেখানে বসে দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ করছেন। তাকে ঘিরে এখন অভ্যুত্থানের নায়কবৃন্দ ফারুক, রশিদ, ডালিম, নূর, পাশা সবাই বঙ্গভবনে অবস্থান নিয়েছে। আর্টিলারির কামান ও ল্যান্সারের ট্যাংকগুলো বঙ্গভবনের চারপাশে বাইরে ভেতরে স্থাপন করা হয়েছে।

সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল শফিউল্লাহ প্রায় সকল ক্ষমতা হারালেন। মেজররা ততক্ষণে বঙ্গভবনে জেঁকে বসেছে। বঙ্গভবন থেকে অফিসে ফিরে এসে ঐদিনই ১৭ তারিখ বিকালে শফিউল্লাহ মিটিং করলেন। জিয়া, খালেদ মোশাররফ এবং বাকি দুই বাহিনী প্রধানও উপস্থিত ছিলেন। ডি. জি. এফ. আই. ব্রিগেডিয়ার রউফও ছিলেন। কিভাবে মেজরদের বঙ্গভবন থেকে ফিরিয়ে আনা যায়। রউফ বললেন, আমরা যা বলি তাদের কাছে তা পৌঁছে যায়। অতঃপর সিদ্ধান্ত হল সবাই শপথ নেবেন, বাইরে এই মিটিং - এর আলোচনার বিষয়বস্তু কেউ কিছু প্রকাশ করবেন না। তাই হল।

কসম খেয়ে মিটিং শুরু হল। অনেকক্ষণ আলোচনার পর সবাই একমত হলেন, বঙ্গভবন থেকে অবিলম্বে মেজরদের ফিরিয়ে আনতে হবে। মজার ব্যাপার, আল্লাহর নামে সবাই শপথ নিলেও পরদিনই বঙ্গভবনের মেজররা মিটিং -এর বিষয়বস্তু সবকিছুই জেনে যায়। তারা মুখ টিপে হাসতে লাগলো। এইতো অফিসারদের কসমের বাহার!

১৯ আগস্ট সকাল ৮ টা। সেনাপ্রধান শফিউল্লাহ ব্রিগেড কমান্ডারদের মিটিং ডাকলেন। ফারুক, রশিদও উপস্থিত ছিল। শফিউল্লাহ অবস্থার বর্ণনা দিয়ে বললেন যে, তিনি ভারতীয় আক্রমণের আশঙ্কা করছেন, অতএব বেঙ্গল ল্যান্সার ও ফিল্ড রেজিমেন্টের উচিত তারা যেন দেশের বৃহত্তর স্বার্থে শহর থেকে ক্যান্টনমেন্টে ফিরে চলে আসে। আলোচনার এক পর্যায়ে এক সময় কর্নেল শাফায়াত জামিল গর্জে উঠল, ওরা ফিরে না এলে আমি তাদের ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করবো। আমি তাদের কোর্ট মার্শাল দাবি করবো। মিটিং বিশৃংখলার মধ্য দিয়ে সমাপ্ত হলো। মতলব টের পেয়ে ফারুক, রশিদ বঙ্গভবনে তাদের অবস্থান আরো সুদৃঢ় করলো

মোক্ষম মুহূর্তে ফারুক রশীদের বিরুদ্ধে কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থা গ্রহণ না করে, চার দিন পর তাদের বিরুদ্ধে শাফায়াতের কোর্ট মার্শাল দাবীর যৌক্তিকতা কেউ খুঁজে পায়নি, কারন ততোদিনে জল অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। ফারুক রশীদ ততোদিনে বঙ্গভবনের মসনদে শক্তভাবে সমাসীন।

মিটিং শুরু হওয়ার আগে কর্নেল শাফায়াত জামিল সেনাপ্রধান শফিউল্লাহর সাথে তার অফিসে আলাদাভাবে ব্যক্তিগত পর্যায়ে মিলিত হয়। তার সাথে ছিল তার স্টাফ অফিসার ব্রিগেড মেজর হাফিজউদ্দিন। শাফায়াত উত্তেজিতভাবে শফিউল্লাহকে বললো, স্যার, আপনি জেনে রাখুন, এতসব সমস্ত গন্ডগোলের পেছনে রয়েছে জেনারেল জিয়ার হাত। তার কথা শুনে শফিউল্লাহ হেসে উত্তর দিলেন, শাফায়াত, এই কথাটা বুঝতে তোমার এতো সময় লাগলো?

আসলে অভ্যুত্থান সফল হওয়ার পর এবার শাফায়াত জামিল অনুভব করলো, এ অভ্যুত্থানে তারতো কোন লাভ হলোনা। বরং শক্তিশালী ব্রিগেড নিয়েও এখন সে উপেক্ষিত। আসল ক্ষমতা চলে গেছে বঙ্গভবনে মেজরদের হাতে। তাহলে তখন নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পালন করে তার কি লাভ হলো? গোস্যায় সে ফোঁস ফোঁস করতে লাগলো।

খন্দকার মোশতাক আহমদ বেশ দক্ষতার সাথে দৃঢ়হস্তে দেশ শাসন করতে লাগলেন। বিশ্বের চতুর্দিক থেকে অভিনন্দনবার্তা আসতে লাগলো। এমনকি মাওলানা ভাসানীও সরকার পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়ে উষ্ণ অভিনন্দন বার্তা পাঠালেন। মোশতাকের নির্দেশে শীর্ষস্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দিন, মনসুর আলী, কামরুজ্জামান, আবদুস সামাদ আজাদ প্রমুখরা অন্তরীণ হলেন। অবশ্য আওয়ামী লীগ অথবা মুজিব বাহিনী ইত্যাদির পক্ষ থেকে সবরকম প্রতিরোধ ক্ষমতা প্রথম আঘাতেই ভেঙে পড়েছে। তাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা এখানে ওখানে পালিয়ে গা ঢাকা দেয়। একমাত্র টাঙ্গাইলের দিকে কাদের সিদ্দিকী কিছুটা প্রতিরোধ গড়ে তোলার চেষ্টা করলে কর্নেল লতিফের নেতৃত্বে দুই ব্যাটালিয়ন সৈন্য পাঠিয়ে তাকে সীমান্তের ওপারে তাড়িয়ে দেয়া হয়। বেশ ছোটখাটো লড়াই হয়ে যায় এবং কিছু সৈন্য হতাহত হয়। একটি হেলিকপ্টারও ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

ইতিমধ্যে মোশতাক আহমদ জেনারেল ওসমানীকে তার ডিফেন্স উপদেষ্টা নিযুক্ত করেন। মেজর জেনারেল খলিলুর রহমান হন চীফ অব ডিফেন্স স্টাফ। এই সময়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো, মেজর জেনারেল শফিউল্লাহর স্থলে মেজর জেনারেল জিয়াউর রহমান সেনাবাহিনীর নূতন চীফ অব স্টাফ নিযুক্ত হন। ২৪ আগস্ট '৭৫ তারিখ থেকে নিযুক্তি কার্যকর হয়। সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে এই গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন করা হলো। ফারুক রশিদের চাপেই যে এটা ঘটলো, তা বুঝতে কারো বাকি রইলো না। রশিদের মতে এটা ছিল পূর্ব নির্ধারিত। সিভিল মিলিটারিতে আরো বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদ পরিবর্তন করা হল। ১৬ অক্টোবর বিমান বাহিনী প্রধান এ. কে. খন্দকারের স্থলে জার্মানী থেকে ডেকে এনে এম. জি. তোয়াবকে এয়ার চীফ বানানো ছিল উল্লেখযোগ্য।

চীফ অব স্টাফের গদি দখল

জিয়াউর রহমানের গদি দখল ছিল আরো নাটকীয়। ২৪ তারিখ অনুমান বেলা ১২ টায় জেনারেল জিয়ার ফোন আসলো। তার উত্তেজিত কণ্ঠ, 'হামিদ Come here just now.'

আমি আমার অফিসে তখন কি একটা কনফারেন্স করছিলাম, বললাম, 'একটু পরে আসলে হবে না?' বলল, 'শাট আপ, কাম জাস্ট নাউ।' আমি মিটিং ভঙ্গ করে তার দিকে ছুটলাম। বলাবাহুল্য জেনারেল জিয়া আমার কোর্স মেট। তার সাথে অফিসের বাইরে আমার ছিল 'তুই' 'তুকার' সম্পর্ক। ছিল মধুর সম্পর্ক।

আমি তার অফিসে ঢুকতেই মিলিটারি কায়দায় ভুট মেরে গর্জে উঠল, Salute properly you Guffy, You are entering Chief of Staff's Office। আমি থমকে গেলাম। সে মুচকি হাসতে লাগল। তার হাতে একখানা টাইপ করা সাদা কাগজ। হেসে হেসে আমার চোখের সামনে সেটা নাড়তে লাগল। বলল, যরঃ ফড়ঃ, হবধফ রঃ। আমি তাড়াতাড়ি চোখ বুলিয়ে দেখলাম, মিনিস্ট্রি অব ডিফেন্স থেকে ইস্যুকৃত অফিশিয়াল চিঠি। তাকে প্রধান সেনাপতি করে নিয়োগপত্র। আমি এগিয়ে গিয়ে তাকে আলিঙ্গণ করে কনগ্রাচুলেশন জানালাম। চিঠিটা পেয়েই সে প্রথমেই আমাকে ডেকেছে। বলল, 'হামিদ, বল এখন কি করা যায়?' জিজ্ঞাসা করলাম, 'শফিউল্লাহ চিঠি পেয়েছে? সে জানে?'

'না, এখনও কেউ জানে না।'

বললাম, 'তাহলে তো তার কাছেও কপি পৌঁছতে হবে। তারপর অফিশিয়ালি সে হয়তো কয়দিন সময় নিয়ে তোমাকে 'হ্যান্ড ওভার' করবে। এখন একটু চুপ থাকো।'

বলল, 'শাট-আপ, আমি কাল থেকেই টেকওভার করবো।' আমি চমকে গেলাম। আমি তাকে বুঝালাম, 'দেখো এটাতো তুমি 'ক্যু' করতে যাচ্ছো না। সরকারের অফিশিয়াল চিঠি রয়েছে। তোমাকে তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেয়াই হয়ে গেছে।'

সে বলল, 'তুই এসব বুঝবি না। হি ইজ এ ভেরি ক্লেভার পারসন। তুমি আগামিকাল পুরো ঢাকা স্টেশনের সব ইউনিটের অফিসার ও সৈনিকদের মাঠে একত্র হওয়ার নির্দেশ পাঠাও।'

আমি দেখলাম মহা সংকট। কিছুতেই তার দেরি সইছে না। কিছুক্ষণ তর্কাতর্কির পর বললাম, 'ঢাকা স্টেশনের সবগুলো ইউনিট আমার অধীনে নয়। তাই তুমি লগ এরিয়া কমান্ডারকে ডেকে নির্দেশটা দিতে পারলে ভাল হবে।' প্রস্তাবে সে রাজী হলো। ব্রিগেডিয়ার মাশহুরুল হক তখন অস্থায়ী লগ এরিয়া কমান্ডার। জিয়া তাকে তৎক্ষণাৎ টেলিফোনে ডেকে পাঠালো। আমি তাড়াতাড়ি জিয়ার অফিস থেকে বেরিয়ে আমার অফিসে ফিরে আসছিলাম। রাস্তায় দেখলাম ব্রিগেডিয়ার মাশহুরুল হকের গাড়ি পতপত করে পতাকা উড়িয়ে হেড কোয়ার্টারের দিকে ছুটে যাচ্ছে। গাড়িতে আমরা কুশল বিনিময় করলাম।

পরদিন সকালে সারা ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে মহা উত্তেজনা। অফিসার জওয়ান সবাই সিগন্যাল মেসের গ্রাউন্ডে সমবেত হয়েছে। কেউ কিছুই জানে না, কি ব্যাপার! ঠিক সাড়ে সাতটার সময় ডেপুটি চীফ জিয়াউর রহমান মঞ্চে এসে হাজির। সবাই অ্যাটেনশন। জিয়া মঞ্চ থেকে চিৎকার দিয়ে গর্জন করে সবাইকে জানিয়ে দিলেন, 'আজ থেকে আমি চীফ অব স্টাফ। আপনারা সবাই আপনাদের ডিসিপ্লিন ঠিক করেন। তা না হলে কঠোর শাস্তি হবে।' বলেই মঞ্চ থেকে নেমে দ্রুতপদে আবার তার গাড়ি চড়ে প্রস্থান। মিটিং তিন মিনিটেই শেষ। সবাই হতবাক, একে অন্যের মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগল। আমি হাসলাম।

প্রস্থানের পথে আমার পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তার আঙ্গুল দিয়ে গায়ে টোকা দিল। 'Follow me'. তাড়াতাড়ি আমি জীপ নিয়ে তার পিছন পিছন ছুটে তার অফিসে গিয়ে ঢুকলাম। চেয়ারে বসে নব নিযুক্ত সেনা প্রধান জিয়াউর রহমান। মুখে তার তৃপ্তির হাসি। বিরল দৃশ্য। বললো, 'কেমন হলো বল?' আমি বললাম, 'ঠিকতো হলো, কিন্তু প্রথম ভাষণটা এরকম চড়া গলায় ধমকের সুরে না বললে কি হতো না?' 'শাট আপ। এটাতো কেবল শুরু। দেখনা আমি কিভাবে সব ব্যাটাকে ডিসিপ্লিন শিখিয়ে দেই।' বললাম 'দোস্ত একটু ধীরে চল্।

'শফিউল্লাহর Reaction কি?' তার জিজ্ঞাসা।

বললাম, 'এখনো কথা হয়নি। দেখি কি বলে।'

চা পর্ব শেষ করে যখন তার কাছ থেকে উঠলাম, তখন দারুণ মুডে সে। ততক্ষণে দু-একটি টেলিফোনও আসতে শুরু করেছে- 'কংগ্রাচুলেশন, স্যার!'

ওদিকে শফিউল্লাহ এ ব্যাপার সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অন্ধকারে। সে তখনও কোন চিঠিই পায় নাই। সে কিছুই জানে না। শফিউল্লাহ আমাকে টেলিফোন করল, 'হামিদ এসব কি হচ্ছে? কে এইসব নির্দেশ দিচ্ছে? কার হুকুমে সকালে স্টেশন অফিসার জওয়ানদের মিটিং ডাকা হলো?' আমি বহুকষ্টে ব্যাপারটা তাকে বুঝিয়ে মাথা গরম না করতে অনুরোধ করলাম। সে দারুণ বিরক্ত ও উত্তেজিত হলো। তবে পরিস্থিতির কারণে সে পরিবর্তন মেনে নিতে বাধ্য হলো। ঐদিন থেকে শফিউল্লাহ আর অফিসেই আসলো না। এইভাবে সেনাবাহিনীর নূতন চীফ অব স্টাফের ঝটকা স্টাইলে গদি দখল পর্ব সম্পন্ন হলো। কোন বিদায় সংবর্ধনা, কোন আনুষ্ঠানিক ডিনার, কিছুরই আয়োজন করা হল না।

জিয়াউর রহমানের সেনাবাহিনী প্রধান হওয়ার সুবাদে ভবিষ্যতে তার আকাশে ওঠার সোপান তৈরি হয়ে গেল। আজন্মদিনের যে চেরাগটির স্বপ্ন এতদিন ধরে সে লালন করে আসছিল, আজ তা হাতে এসে ধরা দিলো।

১৫ অগাস্ট জেনারেল জিয়ার জন্যে সৌভাগ্য কাঠি বয়ে আনলো। অগাস্ট অভ্যুত্থান না হলে জিয়ার উত্থান হতো না। বাঙলাদেশের ইতিহাসও অন্যভাবে লেখা হতো। ফারুক রশিদকে ধন্যবাদ, তারা জিয়ার জন্য খুলে দিলো ভবিষ্যতের অবারিত দ্বার।

অপরদিকে জিয়া চীফ অব স্টাফ হওয়ায় খালেদ মোশাররফ শংকিত হয়ে পড়লো। তার স্বপ্ন ভেঙে গেল। তাকে এবং শাফায়াতকে কলা দেখিয়ে মেজররা বঙ্গভবনে ঢুকে পড়েছে। তাদের দুজনেরই অবস্থান নাজুক হয়ে উঠল। তাদের এখন প্রেস্টিজ পুনরুদ্ধার করার সংগ্রামে লিপ্ত হওয়া ছাড়া আর কোন পথ খোলা রইলো না। এই প্রেক্ষাপটেই পরবর্তিতে সংঘটিত হয় খালেদ - শাফায়াতের ৩রা নভেম্বর অভ্যুত্থান।

অভ্যুত্থানের সময় রাষ্ট্র প্রধানকে কি বাঁচানো যেতো?

(১) ১৫ অগাষ্ট অভ্যুত্থানের গতিধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে দেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা শুরু হলে শেখ সাহেবের উপর আকস্মিক হামলার ভয় যথেষ্ট বৃদ্ধি পায়। সবকিছু জানা সত্ত্বেও সংশ্লিষ্ট ইনটেলিজেন্স এজেন্সীগুলো তাঁর নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়। তাঁর মৃত্যুর জন্যে গোয়েন্দা-ব্যর্থতা যথেষ্ট দায়ী। এমনকি ক্যান্টনমেন্টে সেনা-গোয়েন্দা সংস্থাও সামান্য তৎপর থাকলে শুরুতেই এই অভিযান নস্যাৎ করে দেয়া যেতো।

(২) শেখ সাহেবের নিজের প্রাইভেট বাসভবনে নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছিল খুবই দুর্বল ও অপ্রতুল। বাসায় সুপরিকল্পিত সুদৃঢ় রক্ষাব্যবস্থা থাকলে এসব আক্রমণ সফল হতো না। তাঁর বাসায় যথেষ্ট পুলিশ ও অস্ত্রশস্ত্র মজুদ থাকলেও সেগুলোর সুষ্ঠু ব্যবহার করে কড়া প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলা হয়নি। ১৫ অগাস্টের সকালবেলা তাঁর বাসার ভেতর থেকে আরো ২৫/৩০ মিনিট সময় প্রতিরোধ করতে পারলে ততোক্ষণে রক্ষীবাহিনী, আর্মি, বিডিআর বা অন্যান্য সংস্থা তাঁর সাহায্যার্থে বাসায় পৌঁছে যেতে পারতো। রাষ্ট্রপতির বাসভবনে আর্মি ও পুলিশ গার্ডদের আত্মসমর্পণ বড়ই লজ্জাজনক

ব্যাপার। তারা সবাই মিলে ফাইট করলে নিশ্চিতভাবে আক্রমণ বহুক্ষণ প্রতিরোধ করা সম্ভব হতো। কিন্তু পুলিশেরা কিছুক্ষণ ফাইট করলেও সেনা সদস্যরা নিষ্ক্রিয় থাকে। এটা দায়িত্বহীনতার চরম দৃষ্টান্ত।

(৩) বাসার ভেতর দোতলায় ওঠার পেছন দিকের গেট খোলা থাকায় হামলাকারীরা বিনা ক্লেশে বিনা বাধায় দোতলায় ওঠার অপ্রত্যাশিত সুযোগ পেয়ে যায়। দোতলায় ওঠার সিঁড়িঘরের নিচের এবং উপরের দুটি সিকিউরিটি দরজা বন্ধ থাকলে হামলাকারীদের পক্ষে সরাসরি অপারেশন করা খুবই দুষ্কর হতো। ফলে দোতলার উপর থেকে কামাল-জামালের পক্ষে দীর্ঘক্ষণ প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব হতো। প্রচুর Reaction টাইমও পাওয়া যেতো, ফলে শেখ সাহেব বেঁচে যেতেও পারতেন। রাত্রিবেলা দোতলায় ওঠার সিঁড়িঘরের দুটি দরজাই খোলা রাখার পরিণতি বড়ই আত্মঘাতি প্রমাণ করে।

(৪) আপদকালীন সময়ে তড়িৎ 'রিঅ্যাকশন' করার জন্য কোন 'আপদকালীন প্ল্যান' বা বিশেষ ট্রুপ রাখা হয়নি। এমনকি তড়িৎ মেসেজ পাঠাবার জন্য টেলিফোন ব্যতিত কোন বিকল্প ওয়্যারলেস ইত্যাদিও রাখা হয়নি। যার জন্য গোলাগুলি শুরু হওয়ার পর রাষ্ট্রপতি যথেষ্ট সময় ও সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও সঠিক স্থানে তড়িৎ গতিতে মেসেজ পৌছাতে সক্ষম হননি।

(৫) এতবড় রক্ষীবাহিনীর চ্যানেল ছিল বড়ই দুর্বল, অথর্ব, অকর্মণ্য। চরম মুহূর্তে কমান্ডার ব্রিগেডিয়ার নুরুজ্জামান ছিলেন লন্ডনে। তা না হলে হয়তো রক্ষীবাহিনীর তড়িৎ 'রি-আকশন' শেখ সাহেবকে রক্ষা করতে পারতো। ৩২ নং রোড থেকে শেরে বাঙলা নগর রক্ষীবাহিনী হেডকোয়ার্টার ছিল মাত্র কয়েক মিনিটের দূরত্বে। অথচ ঘটনার সময় কয়েক হাজার রক্ষী সৈন্য নিরবে প্রস্তুত অবস্থায় ওখানে দাঁড়িয়ে রইলো। ফারুকের ট্যাংকের হুমকির মুখে তারা কাঠের পুতুলের মত অনড় হয়ে রইল। রক্ষীবাহিনী মুভ না- করার একমাত্র অজুহাত হিসাবে বলা যায় যে ভোর বেলায়ই মেজর ফারুক ট্যাংক বাহিনী নিয়ে তাদের মুখোমুখি হয়। ট্যাংকের তাক করা ব্যারেলের মুখে তারা ছিল অসহায় এবং প্রবল মনস্তাত্ত্বিক আতংকের মধ্যে।

(৬) গোয়েন্দা প্রধান সালাউদ্দিন সর্বপ্রথম শফিউল্লাহকে আনুমানিক ভোর ৫-১৫ মিনিটের সময় অভ্যুত্থানের খবর দেন। তখন যদি সেনাপ্রধান নিজ উদ্যোগে শাফায়াতের ৪৬ ব্রিগেডের কিছু সৈন্য তড়িৎ গতিতে মুভ করাতে পারতেন, তাহলে হয়তো রাষ্ট্রপ্রধানকে বাঁচানো সম্ভব হতো। ৫-৩০ মিনিটে শাফায়াতকে যখন রাষ্ট্রপতি ভবন আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ দেয়া হয়, তখনো যদি সে কোয়ার্টার গার্ডগুলো থেকে জরুরী ভিত্তিতে কিছু সৈন্য নিয়ে নিজে রওয়ানা দিতো তাহলেও তাঁর বেঁচে যাওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সংকট মুহূর্তে সে একটি সৈন্যও মুভ করালো না।

(৭) মধ্যরাতে অভ্যুত্থান ঘটাতে যাচ্ছে, Source মারফত এরকম একটি আভাস সর্বপ্রথম জানতে পারেন ডি. জি. এফ. আই, ব্রিগেডিয়ার রউফ, রাত অনুমান ২/৩ টার দিকে। কিন্তু তিনি কাউকে কিছু জানাননি। জেনারেল শফিউল্লাহ বললেন, তিনি যে ব্যবস্থা নেন তা হলো, অজানা আশংকায় তিনি তৎক্ষণাৎ তার বাসা ত্যাগ করে পরিবার নিয়ে বাসার পেছনে মাঠে একটি গাছের নিচে লুকিয়ে নিরাপদ আশ্রয় গ্রহণ করেন। ঘটনার পর সকালে বেরিয়ে এসে ব্যর্থতা ঢাকতে বিভিন্ন অসংলগ্ন গল্পের অবতারনা করেন এবং পত্র পত্রিকায় বিবৃতি দেন। অথচ সময়মত সংশ্লিষ্ট সবাইকে সংবাদ দিলে খুব ভোরেই Counter ব্যবস্থা নেওয়া সম্ভব হতো। গোয়েন্দা প্রধান নিশ্চিতভাবে ভোর ৫টার আগেই আক্রমণের খবর পান। তিনি তখনও যদি সরাসরি রাষ্ট্র প্রধানকে রেড টেলিফোনে কথা বলে তাকে সাবধান করে দিতেন, তাহলেও তাঁর বেঁচে যাওয়ার ৮০% সম্ভাবনা ছিল।

(৮) শেখ সাহেব অসম সাহসে এতো গোলাগুলির মধ্যে হামলাকারীদের সামনে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে না এসে যদি তাঁর কামরার দরজা লক করে বাড়ির ভেতরেই কোথাও কোন ঘরে লুকিয়ে থাকতেন, তাহলেও হামলাকারীদের পক্ষে তাঁকে খোঁজ করে বের করতে সময় লাগতো। চাইলে পেছন দিকে তিনি হয়তো পালিয়ে যেতেও পারতেন। কিন্তু তিনি কোনোরকম আত্মরক্ষামূলক পন্থার কথা চিন্তাই করলেন না।

ক্যান্টনমেন্ট থেকে কেন সৈন্য মুভ করলো না?

১৫ অগাস্ট ভোর সাড়ে পাঁচটায় রাষ্ট্রপতি ভবন আক্রান্ত হলো। ক্যান্টনমেন্টে DGFI প্রধান ও সেনা গোয়েন্দা প্রধান ভোর ৫টার আগে অভিযানের খবর পান। সেনাবাহিনী প্রধান খবর পান আনুমানিক সোয়া ৫ টায়। রাষ্ট্রপতির সাথে তার ফোনে শেষ কথা হয় ৫-৫০ মিনিটে। ঢাকার ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াত জামিল আক্রমণ সংবাদ পান সাড়ে ৫ টায়। ভোর ৬ টার দিকে রাষ্ট্রপতি আক্রান্ত হয়ে নিহত হলেন। ক্যান্টনমেন্ট থেকে তার সাহায্যার্থে একটি সৈন্যও মুভ করলো না।

এ ব্যর্থতা কার? বহুদিন পর আজও সবার মনে বারবার এই একটি জিজ্ঞাসা তাড়া করে ফেরে, সৈন্য কেন মুভ করলো না ক্যান্টনমেন্ট থেকে? এ নিয়ে আজও চলছে প্রবল বাক-বিতন্ডা।

প্রথমেই সেনাপ্রধান শফিউল্লাহ আক্রমণের সংবাদ পেয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঢাকার ব্রিগেড কমান্ডার শাফায়াত জামিলকে ভোর সাড়ে ৫টায় ফোন করেন এবং তাকে তৎক্ষণাৎ সৈন্য মুভ করতে বলেন। কিন্তু শাফায়াত জামিল বলছে সেনাপ্রধান তাকে আক্রমণের সংবাদ ঠিকই দেন কিন্তু সৈন্য মুভ করার কোন নির্দেশ দেননি। তাই তখন সে মুভ করেনি। তার ভাষায় শফিউল্লাহ তখন কেবল বিড়বিড় করেছেন। কিন্তু তাকে কোন নির্দেশ দেননি। তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ বিভ্রান্ত, উদভ্রান্ত।

মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে রাষ্ট্রপতির সাথে ফোনে কথা হয় শফিউল্লাহর। তাঁর ফোন পেয়েই শফিউল্লাহ আবারো শাফায়াতকে ফোন করেন আনুমানিক ৬টার দিকে, কিন্তু তখন দেখা যায় শাফায়াত তার ফোনের রিসিভার তুলে রেখেছে। এক্সচেঞ্জ থেকে অপারেটর তা -ই জানায় ঃ শফিউল্লাহর ভাষ্য।

এমতাবস্থায় শফিউল্লাহ্ খালেদ মোশাররফকে ফোন করে তার বাসায় ডেকে এনে তাকে শাফায়াত জামিলের কাছে পাঠান। তার সৈন্য মুভ করাতে। শফিউল্লাহ্ চতুর্দিকে ক্রমাগত ফোন ঘোরাতে থাকেন। ডেপুটি চীফ জিয়াউর রহমান সহ অন্যান্যদের সাথে কথা বলতে থাকেন। তারপর তিনি তৈরি হয়ে অফিসে ছুটে যান।

এখানে তার যে বড় ভুল হলো; তা হলো, তিনি যখন দেখলেন, যে কোন কারণেই হোক শাফায়াত জামিল তার সৈন্য মুভ করছে না, তখন তিনি মাত্র পাঁচ'শ' গজ দূরে অবস্থিত শাফায়াতের হেড কোয়ার্টারে একে ওকে না পাঠিয়ে নিজেই ছুটে গিয়ে শাফায়াতের সৈন্য মুভ করাবার ব্যবস্থা নিতে পারতেন। এখানে তিনি চরম মুহূর্তে টেলিফোন ও কথাবার্তায় অযথা সময় নষ্ট করলেন। কিন্তু একটি সৈন্যও ক্যান্টনমেন্ট থেকে মুভ করাতে পারলেন না।এখানে দ্রুততার সঙ্গে সিদ্ধান্ত নিতে ব্যর্থ হলেন সেনাপ্রধান। তবে সঙ্গত কারণেই বোঝা যায়, ঘটনার ভয়াবহতায় তিনি দারুণ Tension -এ ভুগছিলেন। সম্ভবতঃ উত্তেজিত হয়ে কিছুটা নার্ভাসও হয়ে পড়েন। তবে ঘটনা প্রবাহ থেকে বোঝা যায়, ঐ মুহূর্তে তার ব্যর্থতা ছিল অনিচ্ছাকৃত, মোটেই ইচ্ছাকৃত নয়। কাদের সিদ্দিকী বলেছেন, 'তিনি ছিলেন অথর্ব, অকর্মন্য। আমার মনে হয় এগুলো যথেষ্ট রূঢ় শব্দ।

শাফায়াতের অ্যাকশান

এবার আলোচনা করা যাক ঢাকার পদাতিক ব্রিগেডের কমান্ডার কর্নেল শাফায়াত জামিলের অ্যাকশান নিয়ে। তার অধীনে ছিল ৪০০০ হাজার সৈন্য । ১৫ই অগাষ্ট ভোর বেলা কর্নেল শাফায়াতের ট্রুপ দ্বারা আক্রান্ত হন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। সে ভোর বেলা আক্রমণের নিশ্চিত সংবাদ পাওয়া সত্ত্বেও তার সৈন্যদের নিরস্ত্র করার বা ফিরিয়ে আনার কোন ব্যবস্থাই গ্রহণ করেনি। বরং এখানে ওখানে ঘুরে ফিরে সময় ক্ষেপন করে। সে জিয়াউর রহমানের দিকে যায় নির্দেশ নিতে। সেনা প্রধানকে সে এড়িয়ে চলে।

ক্যান্টনমেন্ট থেকে তার সৈন্য মুভ করতে না-পারার জন্য শাফায়াত সরাসরি সেনাপ্রধানকেই দায়ী করে বলেছে, তিনি তাকে কোন নির্দেশ দেন নাই, তাই সে তার সৈন্য মুভ করে নাই। এরপর বলছে, রশিদ সকালবেলা তার কাছে এসেছিল দু'টি ট্যাংক এবং দু'ট্রাক সৈন্য নিয়ে। এগুলো দেখে সে নাকি তখন কোন অ্যাকশনে যেতে পারেনি।

আসুন, সকাল থেকে শাফায়াতের কিছু অ্যাকশানের পর্যালোচনা করা যাক :

এক। ভোরবেলা আনুমানিক ৫-৩০ ঘটিকায় শাফায়াত সেনাপ্রধানের কাছে থেকে সংবাদ পায় রাষ্ট্রপতি-ভবন আক্রান্ত হয়েছে। তিনি মহাবিপদে আছেন। শাফায়াত একজন Independant ব্রিগেড কমান্ডার। বঙ্গবন্ধুর একান্ত অনুগত ও বিশ্বস্ত কমান্ডার হিসাবেই কর্নেল শাফায়াতের হাতে তিনি ঢাকার পদাতিক ব্রিগেডের পরিচালনা ভার ন্যস্ত করে নিশ্চিত থাকেন। তার কি করণীয় ছিল? তার কি বিপদগ্রস্ত রাষ্ট্রপ্রধানের সাহায্যার্থে তৎক্ষণাৎ সৈন্য নিয়ে নিজেই রওয়ানা দেওয়া উচিত ছিল না? সেনাপ্রধান কি তাকে অ্যাকশনে যেতে নিষেধ করেছিলেন?

মেজর রশিদ ছিল শাফায়াতেরই অধীনস্থ একটি ইউনিটের কমান্ডার। তারই অধীনস্থ একটি ইউনিট এবং তারই অধীনস্থ একজন কমান্ডিং অফিসার, ১৫ অগাস্ট ভোরবেলা ট্রুপস্ নিয়ে বেরিয়ে পড়ল, রাষ্ট্রপতি ভবন আক্রমণ করে ঘটাল হত্যাকান্ড। এরজন্য কি রশিদ একাই দায়ী? দায়-দায়িত্বের কোন কিছুই কি কমান্ডার হিসাবে শাফায়াত জামিলের উপর কিছুই বর্তায় না?

দুই। ভোর ৬ টার সময় রাষ্ট্রপ্রধানকে খুন করে স্বয়ং রশিদই প্রথমে ছুটে আসে ৪৬ ব্রিগেড লাইনে কর্নেল শাফায়াত জামিলের কাছে। তাকে স্যালুট ঠুকে বলে, Sir, we have killed Sheikh. তারই অধীনস্ত অফিসার একজন রাষ্ট্রপ্রধানকে খুন করে এসে তার বসের কাছে রিপোর্ট করার পর একজন কমান্ডার হিসাবে কর্নেল শাফায়াতের কি উচিত ছিল না তৎক্ষণাৎ তাকে অ্যারেস্ট করে সেনাপ্রধানকে রিপোর্ট করা?

তিন। রাষ্ট্রপ্রধান হত্যাকান্ডের সংবাদ সরাসরি হত্যাকারীর কাছ থেকে পেয়েও সে সেনাপ্রধানকে ফোনে কিছুই জানায়নি। সেতো নিজেও তার কাছে দাবী করতে পারতো, 'স্যার অনুমতি দিন। ঘাতক রশীদ আমার ঘরে বসে আছে। আমি তাকে এ্যারেষ্ট করতে চাই।' সেতো কিছুই করলো না। তাহলে কি মৌনং সম্মতি লক্ষণ! এরপর সে নীরবে হেঁটে হেঁটে ডেপুটি চীফের বাসার দিকে রওয়ানা দেয়। প্রশ্ন হলো, এরকম দুর্যোগ মুহূর্তে যেখানে এক একটি সেকেন্ড মহামূল্যবান, সেখানে সে হেঁটে হেঁটে সময় নষ্ট করবে কেন? সময় বাঁচাতে তার গাড়ি ব্যবহার করলো না কেন? সে ঐ মুহূর্তে তার চীফের দিকে না গিয়ে ডেপুটি চীফ জিয়াউর রহমানের দিকেই বা যাবে কেন?

চার। সারা সকাল বেলা রশিদ, ডালিমরা, এমনকি পরে ফারুকও তার এরিয়াতে খোলামেলা হাসিখুশি ঘোরাফেরা করছিল। শাফায়াত তার এরিয়াতে চার হাজার সৈন্য নিয়ে কেন তাদের ঘেরাও করতে পারলো না? এসব রহস্যজনক নয় কি?

সে ছিল ঢাকার পদাতিক ব্রিগেডের স্বাধীন কমান্ডার। চরম মুহূর্তে চার হাজার সৈন্য নিয়ে সে নিষ্ক্রিয় বসে থাকলো। দেশের রাষ্ট্রপ্রধান আক্রান্ত হয়েছেন জেনেও নিজে থেকে সে কোন উদ্যোগ গ্রহণ করার প্রয়োজনীয়তাই উপলব্ধি করলো না। শাফায়াতের এই নিষ্ক্রিয়তা ছিল ইচ্ছাকৃত, নাকি অনিচ্ছাকৃত? এসব গভীর বিশ্লেষণের দাবী রাখে।

পাঁচ। ভোর সাড়ে ৪ টার দিকে তারই ব্রিগেড এরিয়ার ভেতর দিয়ে ফারুক ট্যাংক নিয়ে অগ্রসর হয়। প্যারেড গ্রাউন্ডে তারই জওয়ানরা তাকিয়ে তা দেখলো। শাফায়াতের বাসার পেছন দিয়েই ট্যাংকগুলো বিকট শব্দে গড়িয়ে গেল। প্রশ্ন হলো, ফারুক কোন্ সাহসে বড় রাস্তা দিয়ে না গিয়ে একেবারে শাফায়াতের ব্রিগেড লাইনের

ভিতর দিয়ে তার আক্রমণ-অভিযান পরিচালনা করলো? এটা কি কোন পূর্ব সমঝোতার ইংগিত বহন করে?

আবার রশিদই কিভাবে সাহস করে দেশের রাষ্ট্রপ্রধানকে হত্যা করে প্রথমেই সরাসরি ছুটে আসে তার বসের কাছে সশরীরে রিপোর্ট করতে? কেউ খুন করে একান্ত সুহৃদ ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো কাছে কি খুনের ঘটনা ফাঁস করতে ছুটে আসে?

ছয়। রশিদকে প্রশ্ন করেছিলাম, তোমরা তোমাদের আক্রমণ-প্ল্যানে ট্যাংক - কামান সবকিছু নিয়ে দুর্বল রক্ষী বাহিনীকে কাউন্টার করার চিন্তায় থাকলে, কিন্তু ক্যান্টনমেন্ট অবস্থিত শাফায়াত জামিলের শক্তিশালী ৪৬ ব্রিগেডের কথা একবারও চিন্তা করলে না? রশিদ মুচকি হেসে জবাব দিয়েছিল, 'সেতো আমাদেরই লোক। তার তরফ থেকে আমরা কোন আক্রমণ আশংকা করিনি। শাফায়াত এবং তার অধীনস্থ অফিসার সবাইতো ব্যাপারটা জানতো।' আমার কিন্তু তখন রশিদের কথা মোটেই বিশ্বাস হয়নি। এখন সামগ্রিক ঘটনাগুলো মিলিয়ে দেখলে বুঝতে কষ্ট হয় না, রশিদ একেবারে মিথ্যা বলেনি।

সাত। শফিউল্লাহর নির্দেশে খালেদ মোশাররফ কর্নেল শাফায়াতের হেড কোয়ার্টার আনুমানিক সকাল ৭টার দিকে পৌঁছেন। কিছুক্ষণ পর তিনি সেখান থেকে সেনাপ্রধানকে ফোন করেন, 'স্যার, আমাকে ওরা আসতে দিচ্ছে না, কথা বলতেও দিচ্ছে না।' কারা তাকে আটকে রাখলো, কারা তাকে কথা বলতে দিচ্ছিলো না? কর্নেল শাফায়াতের অফিসে কাদের সাহস হতে পারে ব্রিগেডিয়ার খালেদ মোশাররফকে আটকে রাখার? খালেদ-শাফায়াত ঐ সময় কিসের নাটক করছিলেন? সবই পাঠকদের অনুমানের উপর ছেড়ে দেয়া হলো।

আট। সকাল ৯ ঘটিকা। সেনা প্রধান শফিউল্লাহ এসে উপস্থিত হন ৪৬ ব্রিগেড লাইনে। তিনি সেখানে অপেক্ষা করতে থাকেন শাফায়াত জামিলের জন্য। সে ঐখানে তার এরিয়াতেই ছিল। কিন্তু সে কাছে না এসে দূরে দূরেই থাকে। তারই স্টাফ অফিসার মেজর হাফিজউদ্দিন এগিয়ে আসে রশিদকে নিয়ে সেনাপ্রধানের কাছে। তাকে অনুরোধ করে রেডিও স্টেশনে যাওয়ার জন্য। শাফায়াতের সমর্থন না-থাকলে কিভাবে তার স্টাফ অফিসার প্রকাশ্যে সেনাপ্রধানকে এভাবে অনুরোধ করতে পারে? রশীদের মতে, মেজর হাফিজউদ্দিন শুরু থেকেই তাদের সাথে ছিলো। এবং তার মাধ্যমেই প্রথম থেকে তারা শাফায়াতের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছিল।

নয়। কিছুক্ষণ পরই আসেন বিমান ও নৌবাহিনী প্রধান। তিন সশস্ত্র বাহিনী প্রধান উপস্থিত শাফায়াত জামিলের এরিয়াতে। তারা মিটিং করেন। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে শাফায়াত তাদের ধারে-কাছেও আসলো না, এড়িয়ে চললো। কিন্তু কেন? কেন শাফায়াত তাদেরকে এড়িয়ে চলতে চাইলো? কেন সে ঐ সময় তিন প্রধানের সামনে এসে অভিযান করার জোর দাবী জানালো না? হাস্যকর হলেও সত্য, একটি পত্রিকায় শাফায়াত ক্ষোভ প্রকাশ করে লিখেছে, 'ঐদিন সেনা প্রধানের তত্ত্বাবধানে বিদ্রোহ দমনের কোন যৌথ পরিকল্পনা (স্থল, নৌ, বিমান) গ্রহণ করা হল না', অথচ মজার কথা, সকাল থেকেই বিদ্রোহের তিন প্রধান নেতা মেজর রশীদ, ফারুক, ডালিম, তার এরিয়াতেই তার করমর্দন দূরত্বে নির্বিঘ্নে ঘোরাফেরা করছিল। সেতো হাত বাড়িয়েই তাদের ধরতে পারতো। তা না করে সে এখন বলছে, সেনা প্রধান ওদের ধরতে কেন যৌথ অভিযান পরিকল্পনা করলেন না?

বহুদিন পর জাতীয় সংসদে দাঁড়িয়ে শফিউল্লাহ বক্তব্য রেখেছেন। "ঐদিন ঢাকার ৪৬ ব্রিগেড কমান্ডার আমার কথা শুনেনি, সে জিয়াউর রহমানের কথা শুনেছে" এসব তথ্য বিশ্লেষণের দাবী রাখে।

দশ। সেখান থেকে তিন বাহিনী প্রধান রেডিও স্টেশনে রওয়ানা দেন। কিছুক্ষণ পর প্রচারিত হয় নুতন সরকারের প্রতি তাদের আনুগত্য। এতোদিন পর শাফায়াতের আস্ফালন, 'ওরা ভীরু, ওরা খুনীদের কাছে নতজানু হয়েছে।' প্রশ্ন জাগে, এতোই যদি বঙ্গবন্ধুর প্রতি শাফায়াত অনুগত ছিল, তাহলে তখনই তার চার হাজার সৈন্য নিয়ে তিন চীফসহ ডালিম, রশিদ, ফারুক মোশতাক সবাইকে রেডিও স্টেশনে গিয়ে ঘেরাও করে গ্রেফতার করলো না কেন? সকাল থেকে ওরাতো তার এরিয়াতেই ঘোরাফেরা করছিলো। সকাল থেকে এতোকিছু ঘটে যাচ্ছে তার এরিয়াতেই, অথচ চরম মুহূর্তে বিশ্বস্ত কমান্ডারের কোন প্রতিক্রিয়া নাই! সকল দায়দায়িত্ব সে এড়িয়ে চলে। অবশেষে যুদ্ধ যখন শেষ, তখন কমান্ডারের মঞ্চে আগমন ও তলোয়ার ঘুরিয়ে লম্ফ-ঝম্প!

এগারো। একটি বড় সত্য তিক্ত হলেও সবাইকে উপলব্ধি করতে হবে। ঘটনার দিন রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবুর রহমানের মৃত্যু সংবাদটাই ছিল সবচেয়ে বড় বজ্রপাত। এতে তাৎক্ষণিক ভাবে সৃষ্টি হয় 'ক্ষমতার বিশাল' শূন্যতা। কমান্ডাররা ভাবলো, শেখ সাহেবই যখন নেই, তখন তার জন্য শূন্য মার্গে ফাইট করে আর কি হবে? যা হবার তো হয়ে গেছে, এখন বাস্তবকে মেনে নেয়াই ভাল। হাজার হোক অভ্যুত্থানটাতো ঘটিয়েছে জাতি ভাইরাই। অতএব 'Salute the rising sun'. ১৫ আগস্ট সকালবেলা সময় যতোই গড়াতে থাকে, ক্যান্টনমেন্টের সর্বত্র জাতি ভাইদের সাফল্যকে সমর্থন করার প্রবণতাও ততোই বাড়তে থাকে।

এর প্রতিফলন দেখতে পাই বেলা ১১টার দিকে ৪৬ ব্রিগেডে কর্নেল শাফায়াতের হেডকোয়ার্টারে। অভিযানের সাফল্যে সবাই আনন্দিত। উল্লসিত শাফায়াত জামিল। উল্লসিত উপস্থিত শ'খানেক অফিসার। সর্বত্র কনগ্র্যাচুলেশন, কনগ্র্যাচুলেশন! শাফায়াত, খালেদ দু'জনই শেখ সাহেবের প্রিয়পাত্র হলেও ঐদিন, ঐ মুহূর্তে তাদের কাউকে বিমর্ষ দেখতে পাইনি।

সময় বিভ্রাট

১৫ আগস্ট সকালবেলা অভ্যুত্থান ঘটনাগুলো কখন কিভাবে ঘটলো, কে কখন খবর পায়, এসব নিয়ে বিভিন্ন মহলে আজও যথেষ্ট বিভ্রান্তি রয়ে গেছে। আসুন, প্রকৃত অবস্থা অবহিত হওয়ার জন্য ঘটনাগুলো ধারাবাহিকভাবে যাচাই করে দেখা যাক।

এক। ১৪/১৫ অগাস্ট রাত ১০ ঘটিকার সময় ঢাকা ক্যান্টনমেন্ট থেকে ২ ফিল্ড রেজিমেন্ট মেজর রশিদের নেতৃত্বে তাদের কামানগুলো নিয়ে নির্মানাধীন এয়ারপোর্ট (বর্তমান জিয়া বিমান বন্দর) এর দিকে বেরিয়ে যায়।

দুই। প্রায় একই সময়ে মেজর ফারুকের নেতৃত্বে ক্যান্টনমেন্টের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত বেঙ্গল ল্যান্সারের ট্যাংকগুলো ইউনিট লাইন থেকে এক এক করে বেরিয়ে নিউ এয়ারপোর্টে গিয়ে সমবেত হতে থাকে।

তিন। মেজর ফারুক অভিযানকারী অফিসারদের চূড়ান্ত ব্রিফিং করেন ১৪/১৫ অগাস্টের রাত ১২-৩০ মিনিট থেকে ১-০০ টার মধ্যে।

চার। ক্যান্টনমেন্ট থেকে ফারুকের নেতৃত্বাধীন বেঙ্গল ল্যান্সারের প্রথম ট্যাংকটি নিউ এয়ারপোর্ট এলাকা ত্যাগ করে ১৫ অগাস্ট ভোরবেলা ৪-৩০ মিনিটে। আশেপাশে তখন ফজরের আজান হচ্ছিল। শেষ ট্যাংকটি যখন এয়ারপোর্ট ত্যাগ করে, তখন বেলা প্রায় ৫টা।

পাঁচ। এই গ্রুপের ২০/২৫ মিনিট আগে অর্থাৎ আনুমানিক ৪টায় রাইফেলধারী সৈন্যরা বিভিন্ন গ্রুপে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন কমান্ডারের নেতৃত্বাধীনে আপন আপন টার্গেটের উদ্দেশ্যে এয়ারপোর্ট এরিয়া ত্যাগ করে। তারা ভোর ৪-৪৫ মিনিট থেকে ৫ টার মধ্যেই সমবেত হয় ধানমন্ডির বিভিন্ন টার্গেট পয়েন্টে। মুল টারগেট শেখ সাহেবের বাসায় আক্রমণ শুরু হতে কিছুটা দেরি হলেও অন্যান্য টার্গেট অর্থাৎ শেখ মনি ও সেরনিয়াবাতের বাসায় আক্রমণ শুরু হয়ে যায় ৫টার দিকেই। ধানমন্ডি এলাকা তখন রীতিমতো রণক্ষেত্র।

ছয়। শেখ সাহেবের বাসায় আক্রমণ শুরু হয় যায় আনুমানিক ৫-২০ মিনিট থেকে। রাষ্ট্রপতি মৃত্যুমুখে পতিত হন আনুমানিক ৬ ঘটিকায়।

তারা যেভাবে সংবাদ পেলেন

এক। আক্রমণ অভিযানের খবর সর্বপ্রথম সোর্স মারফত জানতে পারেন DGFI ব্রিগেডিয়ার রউফ। তিনি নিজেই বিবৃতিতে স্বীকার করেন, জনৈক গোয়েন্দা ডাইরেক্টর ফোন করে তাকে রাত আড়াইটা থেকে তিনটার মধ্যে ক্যান্টনমেন্টে ট্যাংক ও সৈন্য চলাচলের জরুরী সংবাদ দেন। যদিও ট্যাংক এর বেশ পরেই বড় রাস্তায় নামে। অবশ্য ক্যান্টনমেন্টের বাইরে ভিতরে অস্বাভাবিক মুভমেন্ট আগেই শুরু হয়ে যায়। এই জরুরী গোপন বার্তা পেয়েও রউফ চুপচাপ থাকেন। রাষ্ট্রপতিকে সাবধান করে দেয়ার প্রয়োজন বোধ করেননি। তিনি যদি তৎক্ষণাৎ সরাসরি রাষ্ট্রপতিকে রেড টেলিফোনে ফোন করে সতর্ক করে দিতেন, অথবা বাসার গার্ডরুমেও ফোন করে গার্ডদেরকেও সতর্ক করে দিতেন, তাহলে হয়তো ১৫ অগাস্টের এই রক্তপাত নিশ্চিতভাবে এড়ানো যেতো।

রাত তিনটা থেকে ভোর সাড়ে ৬টা পর্যন্ত DGFI ব্রিগেডিয়ার রউফ কি করলেন? তা আজও রহস্যাবৃত। জানা যায় ঐ সময় মহা বিপদ আশংকা করে তিনি তার পরিবারকে নিয়ে বাসার পেছনে দূরে গলফ কোর্সে একটি গাছের নিচে লুকিয়ে থাকেন। এবং তিনি সকাল বেলা ৬-৩০ মিনিটে মুক্তি পরে শফিউল্লাহর ব্যাটম্যান হাবিলদার হায়দারের সহায়তায় দেয়াল টপকে পিছন দিক থেকে সেনাভবনে প্রবেশ করেন। তখন ভেতরে জেনারেল জিয়া শফিউল্লাহর সাথে কথা বলছিলেন। রউফ তখনই হন্তদন্ত হয়ে হাজির হন। ব্রিগেড রউফের এসব নাটকীয় ব্যবহার এবং অস্বাভাবিক আচরণের হেতু আজও রহস্যাবৃত।

দুই। উল্লেখ্য, রাষ্ট্রপতি মুজিব এই সময় ব্রিগেডিয়ার রউফকে DGFI পোস্ট থেকে সরিয়ে অন্যত্র বদলি করেন। এতে রউফ অসন্তুষ্ট ছিলেন। তিনি তার দায়িত্বভার সমঝিয়ে দিতে গড়িমসি করছিলেন। পরে ১৫ অগাস্ট হস্তান্তর করবেন বলে ঠিক হয়। ঐ দিনই অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়। নবনিযুক্ত DGFI কর্নেল জামিল ভোরবেলা রাষ্ট্রপতির ফোন পেয়েই আক্রান্ত বাড়ির দিকে ছুটে যান, অথচ ব্রিগেডিয়ার রউফ মধ্যরাতে আক্রমণ সংবাদ পেয়েও নিষ্ক্রিয় থাকেন। রাষ্ট্রপ্রধানকে সতর্ক করার প্রয়োজন বোধ করেননি। অফিসিয়ালি তিনিই ছিলেন তখনো ডি জি এফ আই। এসব ব্যাপার বিশ্লেষণের দাবী রাখে।

তিন। ডি এম আই লেঃ কর্নেল সালাহউদ্দিন সৈন্য ও ট্যাংক চলাচলের সংবাদ পান ৪-৩০ মিঃ থেকে ৫টার মধ্যে। এরপর তিনি ছুটে আসেন সেনাপ্রধান শফিউল্লাহর বাসায় এবং তাকে অবস্থা অবহিত করেন। অর্থাৎ সেনাপ্রধানকে তিনি সম্ভাব্য অভিযানের সংবাদটি দেন ভোর ৫-১৫ থেকে ৫-৩০ মিনিটের মধ্যে। এখানে সেনাপ্রধান জেনারেল শফিউল্লাহর ভাষ্য হল, তিনি গোয়েন্দা অফিসার কর্নেল সালাহউদ্দিনের সাথে তার ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়েই কথা বলছিলেন। আর্টিলারি ও আর্মার্ড ইউনিট গুলোর আক্রমণ সংবাদ পেয়েই তিনি সঙ্গে সঙ্গে কর্নেল সালাহউদ্দিনকে বলেন, 'তুমি শাফায়াতের কাছে যাও এবং তাকে ট্রুপ মুভ করাতে বলো। বাকি আমি দেখছি।' (দুর্ভাগ্যবশতঃ সালাহউদ্দিন ঢাকার বাইরে থাকায় তার সাক্ষাৎকার নেওয়া সম্ভব হয়নি।)

এরপর শফিউল্লাহ ঘরে ঢুকে রাষ্ট্রপতিকে পাওয়ার জন্য ক্রমাগত ফোন ঘোরাতে থাকেন কিন্তু পান না। অতঃপর তার স্ত্রীকে ডেকে ফোন ঘুরাতে বলেন এবং তিনি নিজে আর্মি লাইনে কর্নেল শাফায়াতকে ফোন ঘুরাতে থাকেন এবং তাকে পেয়ে যান। তিনি শাফায়াতকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি আর্মার্ড আর্টিলারি মুভ সম্বন্ধে কিছু জান?'

'না, স্যার।'

'তারা বঙ্গবন্ধুর বাসা আক্রমণ করেছে, তুমি তাড়াতাড়ি ফার্স্ট এবং ফোর্থ বেঙ্গলকে পাঠাও তাদের বাধা দেওয়ার জন্য।' তখন সময় আনুমানিক ৫.৩০ মিনিট। শাফায়াত জামিল অবশ্য বিভিন্ন বিবৃতিতে শফিউল্লাহর এই নির্দেশের কথা অস্বীকার করেছে।

চার। এই সময় থেকে সেনাপ্রধান শফিউল্লাহ রাষ্ট্রপতিকে পাওয়ার জন্য ক্রমাগত ফোন ঘোরাতে থাকেন। কিন্তু পান না। অবশেষে ৫-৫০ মিনিটের দিকে রাষ্ট্রপতিকে

ফোনে পেয়ে গেলেন। রাষ্ট্রপতি তাকে বাসা আক্রান্ত হওয়ার সংবাদ দেন। তখন সময় আনুমানিক ৫-৫৫ ঘটিকা। এরপরই রাষ্ট্রপতির মৃত্যু ঘটে। তখন সময় আনুমানিক ৬ ঘটিকা। শুক্রবার, ১৫ই অগাস্ট ১৯৭৫।

পাঁচ। শেখ সাহেবের ফোন পেয়েই প্রথমে শফিউল্লাহ্ ৪৬ ব্রিগেড কমান্ডার কর্নেল শাফায়াত জামিলকে আবার ফোন করেন কিন্তু তার ফোন খুলান পান। তখন সময় ৬-৩৫ মিনিট থেকে ৬-৫- মিনিট। ঐ সময় অভ্যুত্থানের অন্যতম প্রধান নেতা মেজর রশিদ পৌঁছে গেছে শাফায়াত জামিলের বাসায় তাকে এই সংবাদ শোনাতে যে রাষ্ট্রপতিকে তারা হত্যা করেছে।

ছয়। সকাল ৬টা থেকে ৮টা, এই সময়টাতে শাফায়াতের ৪৬ ব্রিগেডের সৈন্যদল অকুস্থলে পৌঁছে যেতে পারতো counter action এর জন্য, যদিও শেখ সাহেবকে বাঁচানো সম্ভব হতো না। কিন্তু অভ্যুত্থান বানচাল করে দেওয়া সম্ভব হতো। এই সময় শফিউল্লাহ্ ও শাফায়াত জামিল নিজেদের মধ্যে ঠেলাঠেলি করতে করতেই সময় পার হয়ে যায়।

সাত। সকাল ৯-৪৫ মিনিট। সেনা, নৌ, বিমান, তিন বাহিনী প্রধান শাফায়াত জামিলের ব্রিগেড হেড কোয়ার্টারে উপস্থিত। অনুষ্ঠিত হয় গুরুত্বপূর্ণ মিটিং, কিন্তু শাফায়াত জামিল অনুপস্থিত!

আট। সকাল ১১-৩০ মিনিট। রেডিওতে তিন বাহিনী প্রধানের আনুগত্য ঘোষণা।

১৫ই অগাস্ট অভ্যুত্থানে ফারুক - রশিদের সাফল্যের প্রধান কারণসমূহ

সংক্ষেপে নিম্নলিখিত কারণ সমূহ চিহ্নিত করা যায় ঃ

* শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আক্রমণ প্ল্যানের গোপনীয়তা রক্ষা করা।

* মূল লক্ষ্য ছিল স্থির, অভিন্ন এবং 'এক' - অর্থাৎ ৩২ নং রোডের ৬৭৭ নং বাড়ি দখল করা এবং রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিবকে গ্রেফতার অথবা হত্যা। সবাই একক লক্ষ্য অর্জনেই সর্বশক্তি নিয়োগ করে।

* রাষ্ট্রপতি শেখ মুজিব ছিলেন রাষ্ট্রের সকল শক্তির কেন্দ্রবিন্দু ও উৎস। প্রথম আঘাতেই তাঁর নিহত হওয়ার সংবাদে সর্বত্র দেখা দেয় বিরাট 'শূন্যতা' ও অনিশ্চয়তা। তাঁর মৃত্যুতে তাঁর সমর্থকরা মানসিকভাবে একেবারে ভেঙে পড়ে। তাদের প্রতিরোধ ক্ষমতা সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস হয়ে যায়। তাঁর মৃত্যুই ছিল ফারুক-রশিদের সাফল্যের প্রধান কারণ।

* TOTAL SURPRIZE : আক্রমণের আকস্মিকতায় রক্ষীবাহিনী, বি. ডি. আর, মুজিব বাহিনী এমনকি আর্মি সবাই হতবুদ্ধি হয়ে পড়ে। কোনও বাহিনী থেকেই সামান্যতম প্রতিরোধ বা প্রতি-আক্রমণ আসেনি। ফলে আক্রমণকারী দুটি ইউনিট নির্বিঘ্নে তাদের অবস্থান অতি দ্রুত সুসংহত করতে সক্ষম হয়।

* আক্রমণের ব্যাপকতায় সবাই নিশ্চিত ধরে নেয় যে, এটা সেনাবাহিনীর অভ্যুত্থান, অতএব স্বাভাবিকভাবেই ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ে। সে কারণেই অবস্থা ভালভাবে পরখ না করে কেউ তাৎক্ষণিক কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা থেকে বিরত থাকে।

* মুজিব হত্যার রেডিও ঘোষণা ঢাকা ও দেশের সর্বত্র ভয়ংকর মনস্তাত্ত্বিক চাপ সৃষ্টি করে, এতে সবাই বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। ঘোষণাও দেয়া হয় সেনাবাহিনীর নামে। সেটাও ছিল একটা বড় 'ব্লাফ'। রেডিওতে তিন বাহিনী প্রধানের আনুগত্য ঘোষণা আগুনে জল ঢালার কাজ করে।

* ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে অবস্থিত ৪৬ ব্রিগেডের রহস্যজনক নিষ্ক্রিয়তা এবং চরম মুহূর্তে সেনাবাহিনী প্রধানের সিদ্ধান্তহীনতায় সময় নষ্ট করা।

* আক্রমণকারীদের তড়িৎ অ্যাকশান। নির্মম হত্যা, ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে অতি দ্রুততার সঙ্গে 'ঝটিকা' আক্রমণ চালিয়ে সকল সম্ভাব্য টার্গেট ধ্বংস সাধন করে এক ভীতিকর পরিবেশের সৃষ্টি করা।

* আক্রমণ-পরবর্তী সময়ে তড়িৎ গতিতে স্থিতিশীল অবস্থা ফিরিয়ে আনা। সময় ক্ষেপণ না করে নূতন প্রেসিডেন্ট মনোনয়ন এবং তিন বাহিনী প্রধানের আনুগত্য গ্রহণের ব্যবস্থা করা।

* ঢাকা ক্যান্টনমেন্টে অফিসার ও সৈনিকবৃন্দের বিনা দ্বিধায় পরিবর্তিত অবস্থাকে সাদরে গ্রহণ ও জাতিভাইদের সাফল্যে প্রকাশ্যে উল্লাস। সেনা-অভ্যুত্থানের প্রতি জনগণের প্রকাশ্য ও মৌন সমর্থন।

* অলৌকিকভাবে একের পর এক ঘটনাবলী সুষ্ঠু টাইম-টেবিল অনুযায়ী সম্পন্ন হওয়া। কোথাও সামান্যতম বাধা বিঘ্ন না ঘটা।

১৫ অগাস্ট অভ্যুত্থান ঃ একটি পর্যালোচনা

(১) ১৫ অগাস্ট অভ্যুত্থান ছিল এক ব্যতিক্রমধর্মী অভ্যুত্থান। পাক-ভারতের ইতিহাসে এ ধরনের সেনা- অভ্যুত্থান এই প্রথম। মাত্র গুটিকয় জুনিয়র অফিসার ও মাত্র দুটি ইউনিটের অভিযানে এমন একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী অভ্যুত্থান ঘটলো, যা কিনা একটি প্রতিষ্ঠিত সরকারের পতন ঘটিয়ে দিলো।

(২) জুনিয়র অফিসারদের দ্বারা এরকম সরকার পরিবর্তনকারী অভ্যুত্থান রাজনৈতিক ইতিহাসেও খুব বেশি একটা নেই। বলা যেতে পারে, এদিক দিয়ে ফারুক-রশিদ সেনা অভ্যুত্থানের ক্ষেত্রে এক নূতন ইতিহাস সৃষ্টি করলো। মাত্র একই দিনে এতো অল্প সময়ের ব্যবধানে এতগুলো বড় বড় ঘটনা একের পর এক ঘটে গেল, যেন ঘড়ির কাঁটাকেও হার মানায়। যে কারণে ঐ দিনের বিভিন্ন ঘটনার সময়-ক্ষণ নিরূপণ করতে মাথা গুলিয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। এতবড় নাটকীয় ঘটনা রাজনৈতিক এবং মিলিটারি ইতিহাসেও এক বিরল দৃষ্টান্ত।

(৩) অবাক হতে হয় এই দেখে যে, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের মতো এতবড় কালজয়ী একজন নেতার নেতৃত্বাধীন যে সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তা একটি মাত্র

অভ্যন্তরেই তাসের ঘরের মত ভেঙে পড়লো। তাঁর সৃষ্ট রক্ষী-বাহিনী, মুজিব বাহিনী, পুলিশ, বি ডি আর, এমনকি সেনা বাহিনী কিছুই এগিয়ে এলো না সময়মতো অভ্যুত্থান প্রতিরোধ করতে। এই ব্যর্থতা ছিল অমার্জনীয়।

(৪) 'শেখ মুজিবকে হত্যা করা হয়েছে' - ভোর ছ'টায় রেডিওতে মেজর ডালিমের এই ঘোষণা বিদ্যুতের মত সারাদেশে সংবাদ ছড়িয়ে পড়ে, যা বোমার আতংকের চেয়েও মারাত্মক আতংক সৃষ্টি করে। সংবাদটি শুনে রাষ্ট্রীয় কাঠামোও ভেঙে পড়ে। রাষ্ট্রীয় কাঠামো এক ব্যক্তি ভিত্তিক হওয়াতেই এমনটি ঘটলো। ব্যক্তির পতনে সরকারেরও পতন ঘটলো। শেখ সাহেব প্রথম আঘাতেই নিহত না হলে এ অভ্যুত্থান নির্ঘাত ব্যর্থ হতো। এতে কোন সন্দেহ নাই।

(৫) আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ এবং সেনাবাহিনীর তরুণ অফিসারদের মধ্যে সম্পর্ক ভালো ছিল না। পাকিস্তান আমলে সেনাবাহিনীর সাথে বরাবর ছিল তাদের দ্বন্দ্ব। পুরাতন সেই রেশ ধরেই এই মনোমালিন্য। একমাত্র শেখ সাহেবই সেনা-অফিসারদের সাথে সরাসরি সম্পর্ক রাখতেন। অন্যরা এড়িয়ে চলতেন। অপরদিকে সেনাবাহিনীর তরুণ মুক্তিযোদ্ধা অফিসাররাও আওয়ামী লীগ নেতাদের পছন্দ করতো না। কারণ তারা মনে করত দেশের মুক্তির জন্য তারা যখন যুদ্ধ করেছে, তখন এইসব রাজনৈতিক নেতা, পাতি-নেতারা পেছনে কোলকাতায় বসে ফূর্তি করেছে। এধরনের মানসিকতা যথেষ্ট ভুল বোঝাবুঝি সৃষ্টি করে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অবস্থার এতই অধঃপতন ঘটে যে সর্বস্তরের মানুষ তখন একটা পরিবর্তন কামনা করছিল। অতঃপর সেই পরিবর্তনটি যখন এলো, তখন তা রক্তাক্ত হলেও সবাই যেন এটাকে বরণ করে নিলো। দুর্ভাগ্যবশতঃ তার মৃত্যু ঘটে এমন এক সময় যখন তার জনপ্রিয়তা নেমে আসে সম্ভবতঃ তার জীবনকালের সর্বনিম্নে।

(৬) ফারুক-রশিদ দু'জনই বারবার বলেছে, শেখ সাহেবকে হত্যা করার পরিকল্পনা আমাদের ছিল না। ক্যান্টনমেন্টে ধরে এনে সেখান থেকে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নিয়ে গিয়ে বিচারের ব্যবস্থা করাই ছিল আমাদের উদ্দেশ্য। দু'জনেই বলে, বিচারে অবশ্যই তার ফাঁসি হতো এবং আমরা সেখানেই সঙ্গে সঙ্গে ফাঁসির আদেশ কার্যকর করতাম। এটা যুদ্ধাবস্থায় যেমনটি করা হয়। অন্য কথায় তাদের যে প্ল্যান ছিল, তাতে শেখ সাহেবকে হত্যা করারই প্ল্যান ছিল। তা অপারেশনের ছত্রছায়ায় হোক, আর ট্রায়ালের নামেই হোক। তবে একজন রাষ্ট্রপ্রধানকে এভাবে সংক্ষিপ্ত ট্রায়ালে প্রকাশ্য ফাঁসি দিয়ে বা গুলি করে হত্যা করা আরও কলঙ্কজনক ব্যাপার হতো। তাই নয় কি?

(৭) আগস্ট ভোর বেলা ৫.৩০ মিনিটে সেনাপ্রধান গোয়েন্দা প্রধানের কাছ থেকে আক্রমণ সংবাদ পান। শফিউল্লাহ বলেন, তিনি তৎক্ষণাৎ শাফায়াতকে ফোন করে সৈন্য মুভ করতে বলেন। কিন্তু সে সৈন্য মুভ করেনি। বরং সে জিয়াউর রহমানের দিকে হেঁটে হেঁটে তার কাছ থেকে নির্দেশ নিতে যায়। কমান্ডার শাফায়াত বলছে, তিনি কিছুই বলেননি, শুধু বিড়বিড় করেছেন। চরম মুহূর্তে দুই কমান্ডারের বিপরীতমুখী কথাবার্তা তদন্ত ও গবেষণার দাবী রাখে। কারণ ঐ গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে কে দায়িত্বভার এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করছিল, তা নিরূপণ করা অতীব প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

বলা বাহুল্য ঐ সময় ৪৬ ব্রিগেড থেকে তড়িৎ সৈন্য মুভ করলে অভ্যুত্থান নস্যাৎ করে দেওয়া যেত, এমন কি রাষ্ট্রপ্রধানকে বাঁচানোর যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। রাষ্ট্রপতি আক্রান্ত হয়েছেন, এ সংবাদটি জানা মাত্রইতো বঙ্গবন্ধুর বিশ্বস্ত কমান্ডার শাফায়াত জামিলের উচিৎ ছিল নিজে কিছু সৈন্য নিয়ে উন্মাদের মত অকুস্থলে ছুটে যাওয়া এবং তারই অধীনস্থ ইউনিট টু-ফিল্ডকে নিরস্ত্র, নিবৃত্ত করা। এমন কি ৬টার সময়ও সৈন্য মুভ করা যেত। কিন্তু কমান্ডার শাফায়াত সে সুযোগ গ্রহণ করেননি। ট্রুপ কমান্ডার হিসেবে এটা তার চরম ব্যর্থতা। তারই অধীনস্থ ইউনিট, অধীনস্থ অফিসার অভিযান চালিয়ে রাষ্ট্রপতি শেখ দেশের রাষ্ট্র প্রধানকে আক্রমণ করে হত্যা করল, তাৎক্ষণিক ভাবে সংবাদ পেয়েও কমান্ডার শাফায়াত তার ইউনিটকে ফিরিয়ে আনার কোন ব্যবস্থা নিলো না, নিষ্ক্রিয় থাকলো। স্বাভাবিক অবস্থায় এ ধরনের ব্যর্থতার জন্য যে কোন কমান্ডারের 'কোর্ট মার্শাল' হত, কিন্তু শাফায়াত অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপিয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ প্রমাণ করেছে।

(৮) ১৫ অগাস্টের চরম মুহূর্তে জিয়াউর রহমান, খালেদ মোশাররফ, শাফায়াত জামিল এই তিনজনের ভূমিকাই ছিল রহস্যজনক। এই তিনজনেরই কি অভ্যুত্থানকারীদের সাথে আলাদা আলাদাভাবে কোন গোপন সমঝোতা ছিল? ঘটনা প্রবাহ থেকেই এসব প্রশ্নের জবাব খুঁজে পেতে হবে। হামলাকারীগণ কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে প্রথমেই সেনাবাহিনী প্রধানকে ফোন না করে শেখ সাহেব বিভিন্ন দিকে যোগাযোগ করতে যাবেন কেন? তাহলে কি তিনি সেনাপ্রধানের ওপর থেকেও কিছুটা আস্থা হারিয়ে ফেলেছিলেন?

(৯) ভোর ৬টার সময় শফিউল্লাহ খালেদ মোশাররফকে পাঠান ৪৬ বিগ্রেড-এ শাফায়াতের কাছে তড়িৎ ট্রুপ মুভ করাবার জন্য। তিনি সেখানে গিয়ে বলেন, 'কেউ মুভ করছে না, বরং উল্লাস করছে।' তার কথায় শফিউল্লাহ আরো কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন। বেলা ১১টায় ৪৬ ব্রিগেড হেডকোয়ার্টারে খালেদ ও শাফায়াত উভয়কেই দেখা যায় উল্লসিত মুডে। খালেদ মোশাররফ ঐ সময় অপারেশন নিয়ন্ত্রণ করছিলেন এবং রক্ষীবাহিনীসহ অন্যান্য সবাইকে শান্ত করতে মহাব্যস্ত ছিলেন। তিনি ঐ মুহূর্তে একটি বড় কাজ করেন, তা হলো নিজ দায়িত্বে ফারুকের জন্য ট্যাংকের গোলা সরবরাহ করার জন্য জয়দেবপুরে ডিসপ্যাচ নির্দেশ দেন। ট্যাংকের গোলা পেয়ে ফারুকের ট্যাংক বাহিনী বিরাট শক্তিতে পরিণত হয়। অথচ ভোরবেলা তার ট্যাংক ছিল গোলাবিহীন লৌহ শকট মাত্র। ঐ মুহূর্তে ব্রিগেডিয়ার খালেদ এবং কর্নেল শাফায়াত জামিলের হাসিখুশি উল্লাস সবাইকে অবাক করেছিল, কারণ এ দু'জনই ছিলেন শেখ সাহেবের প্রিয় ব্যক্তি।

(১০) সকাল ৮-৩০ ঘটিকা পর্যন্ত আর্মি হেডকোয়ার্টার ছিল সম্পূর্ণ অরক্ষিত। যখন এতবড় একটি অভ্যুত্থান ঘটনা ঘটেছে, তখন শফিউল্লাহ আর্মি হেড কোয়ার্টারের সৈন্যদের সাধারণ সতর্ক অবস্থায় (Stand to) রাখা উচিত ছিল। অন্ততঃ মেইন

গেটটা বন্ধ করে সরাসরি ভিজিটারস অনুপ্রবেশ বন্ধ করা উচিত ছিল। কিন্তু আপদকালীন অবস্থায় খোদ আর্মি হেড কোয়ার্টারেই সাধারণ সতর্ক অবস্থা গ্রহণ করতে সবাই ভুলে যায়। ঐদিন সকালে আর্মি হেডকোয়ার্টারে সামান্যতম নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করলেও সশস্ত্র জীপ নিয়ে মেজর ডালিম সরাসরি হেডকোয়ার্টারে ঢুকে সেনাপ্রধান শফিউল্লাহকে ধরে নিয়ে যেতে পারতো না। এমনকি প্রস্থানের সময়ও আউট গেট বন্ধ থাকলে সে বেরুতে পারতো না। সতর্ক অবস্থা থাকলে ট্রুপস আশেপাশে আত্মরক্ষামূলক পজিশনে থাকতো। কিন্তু হায়! সম্পূর্ণ অরক্ষিত অবস্থায় সেনাবাহিনী প্রধান তার আপন হেডকোয়ার্টারে ধরা খেলেন। এটা এক অভূতপূর্ব ঘটনা।

বলাবাহুল্য, ঐদিন ঐ সময় সেনাপ্রধানকে ধরে রেডিও স্টেশনে না নিয়ে যেতে পারলে ১৫ অগাস্টের ইতিহাস ভিন্নভাবে লেখা হতো। হয়তো জাতিকে ৩ এবং ৭ নভেম্বরের রক্তাক্ত অভ্যুত্থান দেখতে হতো না।

(১১) মেজর ডালিম যখন উন্মুক্ত স্টেনগান নিয়ে শফিউল্লাহর রুমে ঢুকে, তখন সে ছিল অস্ত্রহাতে মারমুখী। শফিউল্লাহ তার সাথে যেতে অস্বীকার করলে সে হয়তো যে-কোন অঘটন ঘটিয়ে দিতে পারতো। তবে যদি হেডকোয়ার্টারে সতর্কাবস্থা থাকতো এবং প্রোটেকশন ট্রুপস অবস্থানে থাকতো, তাহলে শফিউল্লাহকে এভাবে জবরদস্তি অফিস থেকে ধরে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হতো না। বরং ডালিমকেই আটক করে বন্দী করা সম্ভব হতো।

আজ ২০ বছর পরও প্রশ্নটি আমার মনের ভেতর তাড়া করে ফেরে, কি হতো যদি ঐ সময় ডালিমের বন্দুকের মুখে চীফ অব স্টাফ সেনাসদর থেকে বেরিয়ে না যেতেন? কি হতো ডালিমকে হেডকোয়ার্টারে ঘেরাও করে বন্দী করা হতো? কি হতো যদি শাফায়াত সাহস করে ডালিম রশিদকে তার ব্রিগেড এরিয়াতে তার কয়েক হাজার সৈন্য নিয়ে বন্দী করে আটকে ফেলতো!

(১২) শাফায়াত বলেছে তার ৪৬ ব্রিগেড নাকি সকাল থেকে সারাদিনই প্রস্তুত হয়ে বসে ছিল। সে ছিল স্বাধীন ব্রিগেড কমান্ডার। সেতো ইচ্ছে করলে যে কোন সময় প্রতি-আক্রমণে যেতে পারতো। ভোর বেলা শফিউল্লাহ যখন তাকে ফোন করেছিল, তখন গেল না কেন? তখন তার রহস্যজনক নিষ্ক্রিয়তার কি কারণ ছিল? পরে যায় নাই, হয়তো ভালই হয়েছে, তা না হলে নিজেদের মধ্যে বড় রকমের রক্তপাত হয়ে যেতো, লাভ বিশেষ কিছুই হতো না। এছাড়া তার নিজের ব্রিগেডের সৈন্যরাও দুপুরের পর আপন ভাইদের সাফল্যে প্রকাশ্যে উল্লাস করছিল। তা তার শুভেচ্ছায় হোক, অথবা অন্য কারো ইংগিতেই হোক। তখন ছিল ভিন্ন পরিস্থিতি।

(১৩) ভোর ৫-১৫ মিনিটে শফিউল্লাহ যখন প্রথম ডি এম আই কর্নেল সালাহউদ্দিন মারফত খবর পান, তখন যদি তিনি বিভিন্নস্থানে টেলিফোন এবং আলোচনায় সময় নষ্ট না করে, সরাসরি তার বাসা থেকে মাত্র ৫০০ গজ দূরে অবস্থিত শাফায়াতের ৪৬ ব্রিগেডের বেঙ্গল লাইনসে নিজেই গাড়ি নিয়ে ছুটে গিয়ে ব্যক্তিগত নির্দেশে ইনফেন্ট্রি ইউনিটগুলোর কিছু ট্রুপস ঘটনাস্থলের দিকে মুভ করাতেন,

Signature Not Verified
Tito Scohel
Digitally signed by Tito Scohel
DN: cn=Tito Scohel, o=Muktadhara, c=AU
Date: 2004.11.29 15:11:11 +11'00'

তাহলেও অভ্যুত্থানকারী গ্রুপকে ঘেরাও করে এবং মোকাবেলা করা সম্ভব হতো। হয়তো শেখ সাহেবকে বাঁচানোও যেতো। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্তে সেনাপ্রধান করুণভাবে সিদ্ধান্তহীনতায় ভুগছিলেন।

(১৪) কেউ বিমান হামলার কথা চিন্তা করেননি। এই সময় আক্রমণকারী ইউনিটের উপর তড়িৎ বিমান হামলা (Air Strike) চালালে পরিস্থিতির মোড় হয়তো সম্পূর্ণ বদলে দেয়া সম্ভব হতো।

(১৫) ১৫ অগাস্ট অভ্যুত্থানে কোন বিদেশী শক্তির গোপন হাত ছিল কি-না, এ নিয়ে বহু জল্পনা-কল্পনা। বিশেষ করে সি আই এ'র কথা উল্লেখ করা হয়। আসলে অভ্যুত্থানটি সংঘটিত হয় সম্পূর্ণভাবে আভ্যন্তরীণ অসন্তোষ এবং রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলা থেকে। এটাই ছিল বড় সত্য। অন্ততঃ ফারুক, রশিদ আমাকে হলফ করে বলেছে, কোন বিদেশী শক্তির সাথে তারা এ নিয়ে কখনো যোগাযোগ করেনি। খন্দকার মোশতাক আহমদের সাথে আমেরিকান সি আই এ'র যোগসূত্র রয়েছে বলে অনেকেরই ধারণা। তবে প্রকৃত অভ্যুত্থান ঘটানোর পেছনে কোন বৈদেশিক শক্তির সরাসরি হস্তক্ষেপের প্রমাণ এখনো পাওয়া যায়নি। খন্দকার মোশতাক আহমদ অগাস্ট অভ্যুত্থানে সরাসরি জড়িত থাকার প্রমাণ না থাকলেও ঘটনা প্রবাহ প্রমাণ করে নেপথ্যে তিনি ছিলেন এবং সবকিছু জানতেন। অভ্যুত্থানের মেজররা কোন বিদেশী শক্তির মদদে ও উস্কানিতে এ কাজ করেছে বলে নিশ্চিত কোন প্রমাণ নাই। তবে একথাও সত্য যে নিক্সন কিসিঞ্জার প্রশাসন বাংলাদেশ সৃষ্টির ব্যাপারে প্রসন্ন ছিলো না। এ সম্বন্ধে আমার জ্ঞান সীমিত থাকায় এর বেশি বলা সম্ভব নয়।

(১৬) অগাস্ট অভ্যুত্থান সামরিক দৃষ্টিকোণ থেকে ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ মিলিটারি ঝটিকা অপারেশন। এই অভ্যুত্থানে সাফল্যজনক Execution এবং পরিসমাপ্তিতে কার ভূমিকা অধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল? মেজর ফারুক, না রশিদের? সত্যি বলতে কি ফারুক যদিও অপারেশনের মূল কমান্ডার ছিল, কিন্তু সে তো আক্রমণ গড়িয়ে দিয়েই খালাস। আক্রমণ পরবর্তি Reorganisation বা পুনর্বিন্যাস পর্বের দুরূহ কাজটি ঠান্ডা মাথায় যে ব্যক্তিটি সামাল দেয়, সে হলো মেজর রশিদ। ১৫ অগাস্টের সকাল ৬টা থেকে দক্ষ হাতে ঘূর্ণায়মান পরিস্থিতি সামলে না নিলে তাদের পুরো অভ্যুত্থানটাই মাঠে মারা পড়তো। এমন কি নুতন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন এবং তাকে ধরে আনার জটিল কাজটিও ছিল রশিদের। অতএব সার্বিক মূল্যায়নে কমান্ডার ফারুকের চেয়ে মেজর রশিদের পাল্লাই মনে হয় ভারী।

(১৭) ফারুক-রশিদের অভ্যুত্থান স্রেফ দুটি ইউনিটের 'একক' দুঃসাহসিক অভিযান মনে করা হলেও, ততোটুকু 'একক' ছিল না। ফারুক-রশিদ নিজেরাই বলেছে, আমাদের পেছনে 'বড়রা' কেউ না থাকলে কিভাবে এতোবড় অভিযানে অগ্রসর হতে সাহস করতাম! এ থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, তাদের পেছনে বড় র‍্যাংকের কিছু অফিসার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ মদদ জুগিয়েছিলেন। ৪৬ ব্রিগেডের নিষ্ক্রিয়তাই এর একটি দৃষ্টান্ত। ১৫ অগাস্ট অভ্যুত্থান ঘটনায় জিয়ার প্রসঙ্গে জেনারেল